ধূলিগন্ধা

মহাবিদ্যালয় সাহিত্য-পত্রিকা

এপ্রিল, ২০২২

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বলাগড়, হুগলী

Dhuligandha

College Magazine

Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya

Balagarh, Hooghly

April, 2022

সভাপতি –

ড. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ

আহ্বায়ক ও সম্পাদক –

অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ড. প্রসেনজিৎ বসু, ড. সুস্মিতা দাস

সদস্য –

অধ্যাপক হাসিনা খাতুন, অধ্যাপক সঙ্গীতা মণ্ডল, অধ্যাপক মলয় ঘোষ, অধ্যাপক অমৃতা চক্রবর্তী

ছাত্র প্রতিনিধি –

সুস্মিতা বারিক (বাংলা বিভাগ), অলিভিয়া চক্রবর্তী (ইংরেজী বিভাগ), স্নেহা ঘোষ (বিজ্ঞান বিভাগ), অভিজিৎ মাধু (ইতিহাস বিভাগ), অর্ঘ্য দাস (বাণিজ্য বিভাগ), বৃষ্টি দেবনাথ (সংস্কৃত বিভাগ), আকাশ সরকার (সাধারণ কলা বিভাগ)

প্রচ্ছদ : সন্তু কর্মকার

প্রকাশক : ড. প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

মুদ্রণ : মৃত্তিকা প্রকাশনী

প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০২২

‘ধূলিগন্ধা’র জন্মলগ্নে দেওয়া বিজয়কৃষ্ণ মোদকের শুভেচ্ছা-বাণী

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় হল হুগলী জেলার পিছিয়ে পড়া, দরিদ্রতম মানুষ অধ্যুষিত একটি অঞ্চলের আশার আলো, সেখানকার শ্রমজীবী মানুষদের বুকের মধ্যে লালন করা দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্ক্ষার মূর্তরূপ। সেই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সাহিত্য সংকলন প্রকাশের আনন্দময় মুহূর্তে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকলন প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান - বিজ্ঞানের চর্চা একটি নতুনতর মাত্রা পায়। নানান দ্বিধা ও সংকোচ অনেক অনেক সময়ে শিক্ষার্থীর মানসলোকে এক অকারণ জড়তার সৃষ্টি করে থাকে। নতুন ঐ মাত্রায় ধীরে ধীরে উক্ত জড়তা অপসৃত হয়ে সচেতনতার দৃঢ়তা লাভ করে।

আর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় যদি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজ পরিবেশ, নিজ সমাজ, নিজ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে তার সার্থকতা কোথায়? কারণ যে শিক্ষা শুধু শিক্ষিত করে তোলে, সচেতন করে না, তা মানুষকে পশ্চাদমুখ করে দেয়। কিন্তু সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ তো চেয়েছে সম্মুখে এগিয়ে যেতে।

সেই এগিয়ে চলার সাথী হোক ‘ধূলিগন্ধা’, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য সংকলন।

তাং- ৪ মে, ১৯৯৩

বিজয় মোদক

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সভাপতি

পরিচালন সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ মোদক

প্রতিষ্ঠাতা, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

আবির্ভাব : ২৭ জুন, ১৯০৬

তিরোধান : ৯ মে, ১৯৯৪

“দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু”

২০১৯ থেকে সারা পৃথিবী 'করোনা' অতিমারীতে আক্রান্ত। আমরা অকালে হারালাম বহু স্বজন, দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে। সেই সব বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমরা হারিয়েছি আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ড. সুদর্শন রায়চৌধুরীকে। তাঁর প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার-সহায়ক অতীশ দত্তকে আমরা অকালে হারিয়েছি। তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা বাকরুদ্ধ। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। আর তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

“শুভায় ভবতু”

আমাদের দু'জন প্রিয় মাস্টারমশাই – শ্রী মানিক বিশ্বাস (স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ) এবং শ্রী রাজু দত্ত (স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ) ২০২১-এর জুলাই মাসে এই মহাবিদ্যালয় ছেড়ে অন্য কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন উজ্জ্বল এবং গৌরবময় হোক – আমরা এই শুভকামনা জানাই।

আরেকদিকে – ২০২১-এর এপ্রিল মাসে – দীর্ঘ কর্মজীবন পার করে অবসর নিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষাকর্মী শ্রীমতী তপতী দাস এবং ২০২২-এর জানুয়ারী মাসে অবসর নিলেন আরেক প্রাণবন্ত মাস্টারমশাই শ্রী মৃণাল কান্তি রায় (স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, বাণিজ্য বিভাগ)। তাঁদের অবসর জীবন হোক নীরোগ, প্রশান্ত ও আনন্দময়।

মহাবিদ্যালয় আপনাদের ভোলেনি... ভুলবে না...।

অধ্যক্ষের কলমে

বিগত বছর দুই আমরা ছিলাম ঘরবন্দী, বিশ্বমহামারী কোভিড-১৯ -এর কারণে। পঠন পাঠন চলেছে অনলাইন মাধ্যমে। আমরা প্রত্যেকেই আনন্দিত হলাম যখন আবার আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাত্র-ছাত্রীদের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। শিক্ষাঙ্গণ যেন তার প্রাণ ফিরে পেল। শিক্ষাজগতের স্বাভাবিক জীবনে মননশীল চর্চা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই কথা মাথায় রেখে আমরা নতুন উদ্যমে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মনন চর্চার মাধ্যমে "ধূলিগন্ধা" পত্রিকা প্রকাশে নতুন উদ্যোগ নিয়েছি। পত্রিকা প্রকাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থী, অধ্যাপক, চিত্রকরেরা তাঁদের প্রতিভা পরিস্ফুটনে সাহায্য করবেন।

বিশ্ব মহামারীর সময়েও নানা সেবা কাজে আমাদের মহাবিদ্যালয় যুক্ত ছিল। শ্রেণিকক্ষের বাইরেও যে অনলাইন মাধ্যম, তাকে পূর্ণ ব্যবহার করে নিয়মিত রুটিন অনুসারে ক্লাস যেমন হয়েছে, একইভাবে এই পর্বে শতাধিক ওয়েবিনার সংগঠিত করেছে মহাবিদ্যালয়। অনলাইনেই নানান দিবস পালনে যুক্ত থেকেছেন শিক্ষার্থী, অধ্যাপকেরা।

মহাবিদ্যালয় এখন আধুনিকীকরণের দিকে পূর্ণ বিকশিত। আমাদের গ্রন্থাগার পূর্ণ ডিজিটাল। আধুনিকতম কম্পিউটার ল্যাব আমাদের মহাবিদ্যালয়কে আধুনিক করে তুলতে পেরেছে। এ কেবল অধ্যক্ষের একার কাজ নয়। অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন মণ্ডলীর যৌথ প্রয়াসে এই কাজ সম্ভব হয়েছে। একদিন চেঁচার বেড়ার যে কলেজ নিজের সর্বস্ব দান করে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিজয়কৃষ্ণ মোদক তৈরি করেছিলেন, তার এক একটি সাফল্য আসলে ওই মহান বিপ্লবীকেই আমাদের দেওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি।

শুভেচ্ছা সহ -

ড. প্রতাপ ব্যানার্জী,

অধ্যক্ষ

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

সভাপতির শুভেচ্ছা বার্তা

বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হতে চলা [২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ] 'ধূলিগন্ধা' পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কবি লেখক প্রবন্ধকারকে আমার তরফ থেকে জানাচ্ছি অশেষ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের।

সেই যেমন একটি ছোট্টবীজ মাটির বুকে একটু জায়গা করে নিতে পারলে একদিন জিজীবিষার প্রবল তাড়না থেকে আকাশের বুকে ডালপালা মেলে দিতে সক্ষম হয়, ফুল ফল আর ছায়া বিস্তার করে— তেমনই আজ যেসব ছাত্রছাত্রী ধূলিগন্ধা পত্রিকার মাধ্যমে লেখার হাত পাকাচ্ছেন, হয়তো আপনাদের মধ্য থেকে কেউ হয়ে উঠবেন আগামীর এক নক্ষত্র কবি, লেখক। যার জন্য একদিন গর্বিত হবে বলাগড় কলেজ সহ গোটা বলাগড়বাসী।

সেই আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সহ কলেজের ছাত্রছাত্রী, কবি, লেখক সবার প্রতি রইলো আমার অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা। সবাই ভালো থাকুন।

আপনাদের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী।

শ্রী মনোরঞ্জন ব্যাপারী

সভাপতি, পরিচালন সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

সূ চী প ত্র

সম্পাদকীয় ১১

প্রবন্ধ

হুগলী জেলাকে নিরক্ষতা মুক্ত করার দায়িত্ব কার? — বিজয় মোদক **১২**

মোক্ষ — শুভেন্দু মণ্ডল **১৪**

অনুরাগের কথা — সোমা সরকার **১৮**

সোনালী মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি — সুদীপা সরকার ২০

রুশোর রাষ্ট্রচিন্তা — রাণা বর্মণ ২৫

Sarojini Naidu : Nightingale of India – Pinki Roy ২৭

বীরাঙ্গনা কাব্যে পুরাণ - প্রভাব — সুস্মিতা বারিক ২৮

গানের ভুবন — অঙ্কিতা ব্যানার্জী **৩১**

গল্প

মোহরাত্রি — ড. প্রসেনজিৎ বসু **৩৩**

নাটক

সৌরস্নেহ — দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য **৩৯**

কবিতা

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণে — ডালিয়া হোসেন ৪৬

অপেক্ষা — খেয়ালী দেবনাথ ৪৯

ভিখারিণী মেয়ে — সীমা বৈরাগী ৫০

করোনা ক্রোড়পত্র :

করোনার কালবেলা : একটি সাক্ষাৎকার — পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং ড. প্রসেনজিৎ বসু ৫৫

করোনা — শীর্ষা মুখোপাধ্যায় ৫৯

চিত্র - স্নেহা বিশ্বাস

সম্পাদকীয়

"একদিন ঝড় থেমে যাবে।

পৃথিবী আবার শান্ত হবে।"

অবশেষে ঝড় থামল। রোগের, মৃত্যুর, অতিমারীর ঝড়। কিন্তু পৃথিবী শান্ত হলো কি? সমুদ্রমেখলা বসুন্ধরা এখনও কেঁপে-কেঁপে উঠেছেন দুঃস্বপ্নগ্রস্তা মানবীর মতো। বিপদ হয়তো গেছে, কিন্তু তার ছায়াটুকু এখনও রয়ে গেছে আমাদের দেহে এবং মনে। থমকে-যাওয়া কালচক্র আবার ঘুরতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু গতিতে তার আগের সেই ছন্দ এখনও ফেরেনি। সব মিলিয়ে এ যেন পৃথিবীর নবজন্ম।

এমন এক সময়ে আমরা 'ধূলিগন্ধা' প্রকাশ করলাম। বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের শিল্প-সাহিত্য পত্রিকা এই 'ধূলিগন্ধা'। আমাদের জীবন থেকে গল্প-কবিতা সরে যাচ্ছিল; মুছে যাচ্ছিল ছবির রঙ। 'ধূলিগন্ধা' আবার তা ফিরিয়ে আনল। আমরা মরণ থেকে মননে ফিরলাম।

এই সংখ্যায় যারা/যাঁরা লেখা এবং ছবি দিল/দিলেন— পত্রিকা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। সরস্বতীর বীর সৈনিক তাঁরা। বিশেষ ধন্যবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশন শিল্পীদের। আর ধন্যবাদ— হে সুধী পাঠিকা/ পাঠক—যিনি এই মুহূর্তে সযত্নে পত্রিকাটি পড়ছেন— আপনাকে।

আমাদের ধূলিগন্ধা পৃথিবী দ্রুত নিরাময় লাভ করুক।

শুভায় ভবতু

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় , ড. প্রসেনজিৎ বসু, ড. সুস্মিতা দাস

আহ্বায়ক

পত্রিকা সমিতি

বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়

হুগলী জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার দায়িত্ব কার?

বিজয় মোদক

হুগলী জেলার মধ্যে বলাগড় থানা সর্বাপেক্ষা দরিদ্র অঞ্চল। শতকরা ৮০ জন মানুষই সারাদিন পরিশ্রম করে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে। তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে নিরক্ষরতা।

১৯৩৯ সালের বন্যায় শ্রীকান্ত গ্রামে এসে সত্যিকারের গ্রামের চেহারা দেখে প্রকৃত ভারতবর্ষকে দেখলাম। শতকরা ৯৫ ভাগেরই জমি নেই, ভাগ চাষ করে খায়; মেয়েরা সারারাত ধরে চিঁড়ে কোটে। সকলেই তপশিলী ক্ষেত মজুর; দু' একজন মানুষ ছাড়া সকলেই ক্ষেতমজুর; দু' একজন মানুষ ছাড়া সকলেই নিরক্ষর। ১৯৪৬- এ তেভাগা আন্দোলন করে কিছু খড় আদায় হল। আমাকে নিয়ে সকল গ্রামবাসীরই শ্রম দিয়ে তৈরী হল ১৯৪৭ সালে তপশিলীদের হাতে গড়া নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা - হুগলী জেলার মধ্যে প্রথম তপশিলী স্কুল। আজ সে গ্রামে ৭/৮ জন স্নাতক বেরিয়ে এসেছে। একজন মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। শিক্ষার ব্যবস্থা তারা নিজ শক্তিতে আদায় করেছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৪৫ বছর চলে গেছে; ভারতের সংবিধানের প্রতিশ্রুতি : ১০ বছরের মধ্যে সকল বয়স্ক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। শাসকশ্রেণীকে রং বেরং-এর রঙ্গীণ শিক্ষা ব্যবস্থার ঢক্কানিনাদ ছাড়া ৪৫ বছরের ফাঁক পূরণ করতে সুলক্ষণীয় কিছু দেখা যায়নি।

রাষ্ট্রসংঘ হিসেব করেছে ২০০০ সালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অর্ধেক নিরক্ষর মানুষের বাসভূমি হবে। শাসক শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী, তারা শিক্ষিত অতি শিক্ষিত। তাদের আছে শিল্পের উপর অধিকার, জমির উপর অধিকার, ভোগের অধিকার। আর যারা শিল্পে মেহনত করে, মাটি খুঁড়ে সমাজের জন্য অন্ন জোগায়, তারা নিরন্ন, শিক্ষাহীন নিরক্ষর। সভ্যতার উজ্জ্বল প্রদীপের সকল ঔজ্জ্বল্য উপর তলার মানুষই ভোগ করবে; আর প্রদীপের তলায় ক্লেদাক্ত, ঘর্মাক্ত আলোহীনতার মধ্যে সভ্যতার পিলসুজ তারাই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে থাকবে। সভ্যতার এই নিদারুণ প্রহসন বন্ধ করার দায়িত্ব কারা নেবে?

স্বাধীনতার পর ৪৫ বছর ব্যাপী দীর্ঘ প্রতীক্ষা এই শিক্ষা দেয়, উপর তলার একাংশ যত সহানুভূতিশীল হোন না কেন, রাজশক্তি যদি এ দায়িত্ব পালন না করে, এ কাজ অসম্ভব।

যেখানে রাজশক্তি জনতার হাতে গেছে, আলাদিনের প্রদীপের যাদুস্পর্শে সকলের গায়েই সভ্যতার আলো পড়েছে, সকল মানুষের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। একদা ১৯২৮ সালে রবীন্দ্রনাথ নিরক্ষর চাষী মজুরদের হাতে গড়া রাশিয়ায় গিয়ে অত্যাশ্চর্যভাবে বলে ছিলেন, 'এখানে না এলে এ জীবনের তীর্থযাত্রা সফল হত না।' চীন, ভিয়েতনাম, উ. কোরিয়া, কিংবা নিকারাগুয়া শিক্ষায় আলাদিনের প্রদীপের অত্যাশ্চর্য শক্তি নিয়োজিত করেছিল। এ থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, জনশক্তি যখন আত্মশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সমাজ দীপ্যমান হয়, হয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

ভারতের রাজশক্তি এখনও শিক্ষা ব্যবস্থার নব নব রূপ প্রবর্তনের কথা ভাবুন, 'কেন্দ্রীয় স্কুল' 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড'-এর নানা ফানুস আকাশে ওড়াতে থাকুন। কিন্তু সাধারণ মানুষ, দেশপ্রেমিক ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকতে পারেনা। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্বাক্ষরতা বিস্তারের রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে। সারা হুগলী জেলায় স্বাক্ষরতার আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছে। হুগলী জেলা নিরক্ষরতামুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। সম্প্রতিকালে পরবর্তী শিক্ষা পর্যায় শুরু হতে চলেছে। গ্রামে-গঞ্জে, শহর বস্তিতে সর্বত্র, আবার তৃণমূলে নিরক্ষর মানুষের কাছে এই শিক্ষা পাঠক্রমকে নিয়ে যেতে হবে। হুগলী জেলার দেশপ্রেমিক মানুষ, শিল্পপতি, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসাজীবি, শিক্ষক, ছাত্র-সহযোগে সকল দেশসেবী মানুষেরই আজ এই মহাযজ্ঞে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রয়োজন হাজার হাজার দেশব্রতী স্বার্থত্যাগী, নিষ্ঠাবান শিক্ষক শিক্ষিকার দল। তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হোক তৃণমূল অবহেলিত মানুষের চেতনায় নীরব নিঃশব্দ বিপ্লব।

(পুনর্মুদ্রিত)

মোক্ষ

শুভেন্দু মণ্ডল

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ

'মোক্ষ' শব্দটি মূল “মুচ” শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া। মোক্ষ মানে মুক্তি বা স্বাধীনতা। মোক্ষ এমন একটি ধারণা, যার অর্থ পুনর্জন্ম বা সংসার জীবন থেকে মুক্তি।

মোক্ষ বা মুক্তি হচ্ছে আত্মার মুক্তি-জীবন-যন্ত্রণা থেকে, ভব-বন্ধন থেকে, আত্মার মুক্তি। ভব-বন্ধন হচ্ছে জন্মমৃত্যুচক্রে আবদ্ধ হওয়া। জীবের জন্মমৃত্যুচক্র অনাদিকাল থেকে আবর্তিত হয়ে চলেছে – জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যু পর পুনর্জন্ম-এভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে। একেই বলে সংসারচক্র বা ভবচক্র। এর কোন আদি নেই, তবে এর অন্ত (শেষ) আছে এবং অন্তসাধনও সম্ভব। সাধনার দ্বারা জীব জন্মমৃত্যুচক্রের আবর্তন রোধ করতে পারে। জন্মমৃত্যুচক্রের আবর্তনকে নিরোধ করাই হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ। মোক্ষপ্রাপ্তি হলে জীবকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না এবং জন্মজনিত দুঃখভোগও করতে হয় না। মোক্ষ হলো সব কিছু দুঃখভোগ থেকে মুক্তি।

ভারতীয় দর্শন অনুসারে মানব জীবনের চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই চারটি পুরুষার্থ হল - ধর্ম (সঠিক ও নৈতিক জীবন), অর্থ (বস্তুগত উন্নতি, উপার্জনের নিরাপত্তা, জীবিকা), কাম (আনন্দ, উদ্দীপনা ও আবেগের পূর্ণতা) এবং মোক্ষ।

এই বার জানতে হবে পুরুষার্থ কী? পুরুষের অর্থ হচ্ছে পুরুষার্থ। 'পুরুষ' অর্থে 'সচেতন মানুষ' আর 'অর্থ' অর্থে 'কাম্যবস্তু' বা 'প্রয়োজন'। 'পুরুষার্থ' বলতে বোঝায় "মানুষ সচেতনভাবে যাকে তার কাম্যবস্তু রূপে গ্রহণ করে”। 'কাম্য' অর্থে "যা লব্ধ নয় বা সাধনার দ্বারা যাকে লাভ করা যায়। মানুষ যে বস্তুকে মূল্যবান মনে করে তাকে লাভ করার জন্য সাধনা করে , তাই তার জীবনে 'পুরুষার্থ'।

মানব জীবনের এই পরমার্থকে মোক্ষবাদীরা বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন – মোক্ষ, মুক্তি, কৈবল্য, অপবর্গ, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি। মোক্ষ, নির্বাণ ও কৈবল্য শব্দগুলি মাঝে মাঝে সমার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়, কারণ এগুলি সবাই এমন অবস্থাকে নির্দেশ করে যা একজন ব্যক্তিকে দুঃখ ও কষ্টের সমস্ত কারণ থেকে মুক্তি দেয়। যাইহোক, আধুনিক যুগের সাহিত্যে, বিভিন্ন ধর্মে এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতাদর্শে এই ধারণাগুলির বিভিন্ন প্রাঙ্গণ রয়েছে।

নির্বাণ অর্থে মোক্ষ :- বৌদ্ধদর্শনে মোক্ষকে নির্বাণ বলা হয়। বৌদ্ধ মতে আমাদের জীবন দুঃখময়, জীবনে দুঃখই সত্য। এই দুঃখের নানা কারণ আছে, এই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভকে নির্বাণ বলা হয়েছে। এই নির্বাণ লাভ কীভাবে সম্ভব তা বৌদ্ধদর্শনে ভালো ভাবে বর্ণনা করা আছে। নির্বাণ হল এক শাশ্বত আনন্দময় অবস্থা। নির্বাণ লাভের পর চেতনা ভয়শূন্য, দুঃখশূন্য, শান্ত ও আত্মসমাহিত অবস্থায় বিরাজ করে। "নির্বাণং পরমং সুখং"। বৌদ্ধ মতে নির্বাণলাভ এই জীবনেই সম্ভব। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধির অনুশীলনের দ্বারা জীবিতকালেই নির্বাণ লাভ করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বুদ্ধদেবের জীবন উল্লেখ করা হয়।

কৈবল্য অর্থে মোক্ষ :- নির্বাণের পরিবর্তে মোক্ষের অনুরূপ একটি ধারণা কৈবল্য। সাংখ্য-যোগ দর্শনে মোক্ষকে কৈবল্য বলা হয়। কৈবল্য হল নিজের আত্মাকে মুক্ত করার জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জগতের সাথে, মিলনের সাথে একাকীত্বের উপলব্ধি।

অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স অর্থে মোক্ষ :- ন্যায়–বৈশেষিক দর্শনে জীবের মুক্তিকে অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স বলা হয়। অপবর্গের অর্থ হচ্ছে আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি। জীবের মুক্তাবস্থায় আত্মার স্থূল দেহ, এমনকি সূক্ষ্ম দেহও থাকে না। দেহের সাথে সংযোগ থাকলে আত্মার আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি সম্ভব হয় না। এজন্য মুক্ত অবস্থায় আত্মার দেহ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এমনকি মনের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দেহ থাকলেই ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। জীবের অপবর্গ বা মুক্তি ঘটলে আত্মার পুনর্জন্ম লাভের আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় জৈনদর্শনেও মোক্ষের আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে দেখা যায় যে এই মুক্তি লাভ এই জীবদ্দশাতেই সম্ভব। যিনি মোক্ষ লাভ করেন তিনি সিদ্ধপুরুষ বা তীর্থঙ্কর। এই তীর্থঙ্কর জীবদ্দশাতেই কেবল জ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা লাভ করে। কামনা-বাসনা জনিত কর্মশক্তির প্রভাবে আত্মা এক বিশেষ প্রকার দেহ ধারণ করে। এই প্রকার দেহধারণই আত্মার বন্ধনদশা। এই বন্ধনদশা থেকে মুক্তি লাভ করাই হল মোক্ষ প্রাপ্তি।

মীমাংসা দর্শনেও পরম পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের মতে, স্বর্গলাভই পরম পুরুষার্থ। বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু সকাম-কর্মের ফল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ করা গেলেও তা অনন্তকালের জন্য হতে পারে না। নিষ্কামভাবে (স্বর্গলাভের বাসনা পরিত্যাগ পূর্বগ) বেদবিহিত কর্ম সম্পাদন করলে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় বা মুক্তিলাভ হয়।

সবশেষে অদ্বৈত বেদান্ত এর কথা বলা যাক, অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করের মতে, জীবই ব্রহ্ম, জীবাত্মাই পরমাত্মা। জীবাত্মার পরমাত্মারূপে উপলব্ধিই হল মোক্ষ বা মুক্তি। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"- আমিই ব্রহ্ম, — এই প্রকার জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞানই মুক্তি। শঙ্করের মতে মুক্তি

কেবল আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি নয়, তা এক অনাবিল আনন্দময় অবস্থা। মুক্তাবস্থায় আত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করে। মুক্তি হচ্ছে ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্মে লীন হওয়া।

পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভের বিভিন্ন পন্থা :- ভারতীয় দার্শনিকরা মোক্ষ লাভের জন্য মূলত তিনটি পথের উল্লেখ করেছেন - জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানের পথ, কর্মমার্গ বা কর্মের পথ, ভক্তিমার্গ বা ভক্তির পথ। মানব মনের তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে - জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা বা সংকল্প। তিনটি বৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্যক্তির চরিত্রগত তারতম্য দেখা যায়। যাদের মধ্যে জ্ঞান প্রবল তারা জ্ঞানমার্গী, যাদের মধ্যে অনুভূতি প্রবল তারা ভক্তিমার্গী এবং যাদের ইচ্ছা প্রবল তারা কর্মমার্গী।

বিভিন্ন মোক্ষবাদী দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সাধন পদ্ধতি দেখা যায় -

জৈনমতে :- জৈনগন জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই মোক্ষ সাধনের পথ বলেন। জৈনমতে মোক্ষলাভের পথ হচ্ছে - সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচরিত্র। জৈনশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হচ্ছে সম্যকদর্শন, আত্মা ও অনাত্মা, বন্ধন ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে সম্যকজ্ঞান এবং পঞ্চ মহাব্রত পালন হচ্ছে সম্যকচরিত্র। পঞ্চ মহাব্রত বলতে বোঝায় - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (ইন্দ্রিয়কে বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা)। এই তিনটি পথের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্ভব। এই তিনটিকে একত্রে জৈনরা 'ত্রিরত্ন' বলেছেন।

বৌদ্ধমতে :- বৌদ্ধদর্শনে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের জন্য জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে বন্ধনের কারণ হিসাবে দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ভবচক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের উপায়স্বরূপ বুদ্ধদেব 'অষ্টাঙ্গিক মার্গের' নির্দেশ দিয়েছেন। সাধন মার্গের আটটি অঙ্গ হল - ১. সম্যক দৃষ্টি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান, ২. সম্যক সংকল্প অর্থাৎ সঠিক ভাবে জীবন-যাপনের দৃঢ় ইচ্ছা ৩. সম্যক বাক অর্থাৎ সত্য কথন, ৪. সম্যক কর্মান্ত অর্থাৎ সংযত আচরণ, ৫. সম্যক আজীব অর্থাৎ সৎ জীবিকা, ৬. সম্যক ব্যায়াম অর্থাৎ কুচিন্তা বর্জন ও সুচিন্তা অনুশীলন, ৭. সম্যক স্মৃতি অর্থাৎ সত্যজ্ঞান অবারিত স্মরণ, ৮. বা সম্যক সমাধি অর্থাৎ সত্যকে ধ্যান।

সাংখ্য-যোগ মতে :- সাংখ্য-যোগমতে, জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করেই মোক্ষ লাভ সম্ভব। পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান মুক্তির উপায়। আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান হচ্ছে বিবেকজ্ঞান। আত্মজ্ঞান না হলে মোক্ষ হয় না, মোক্ষ সাধনের জন্য এখানে অষ্ট যোগাঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে - ১. যম ২. নিয়ম ৩. আসন ৪. প্রাণায়াম ৫. প্রত্যাহার ৬. ধারণা ৭. ধ্যান ও ৮. সমাধি। এই অষ্ট যোগাঙ্গের দ্বারা মোক্ষ লাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে :- ন্যায়-বৈশেষিক মতে জ্ঞানমার্গ অনুসরণ করে মোক্ষ লাভ সম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি। তত্ত্ব হচ্ছে বারোটি প্রমেয় পদার্থ - ১. আত্মা ২. শরীর ৩. ইন্দ্রিয় ৪. অর্থ ৫. বুদ্ধি ৬. মন ৭. প্রবৃত্তি ৮. দোষ ৯. প্রেতাভাব বা পুনর্জন্ম ১০. ফল ১১. দুঃখ ও ১২. অপবর্গ। এই বারোটি প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান লাভের দ্বারাই মোক্ষ লাভ সম্ভব।

মীমাংসা মতে :- মীমাংসকদের মতে স্বর্গলাভই পরমার্থ বা মোক্ষ। বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এই কর্ম তিন প্রকার - ১. নিত্যকর্ম ২. নৈমিত্তিক কর্ম ও ৩. কাম্যকর্ম। এই তিন প্রকার কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে :- অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করের মতে, জ্ঞানমার্গই মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পথ। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানই মুক্তি। এই প্রকার জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ হচ্ছে বেদবাক্য শ্রবণ। মনন হচ্ছে বেদান্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ। নিদিধ্যাসন হচ্ছে ব্রহ্মকে ধ্যানের বস্তু করে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি করা। এই প্রকার উপলব্ধিই মোক্ষ বা মুক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী এবং তথ্যসূত্র :-

১. ভারতীয় দর্শন — ড. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য।

২. ভারতীয় দর্শন — দেবব্রত সেন।

৩. ভারতীয় দর্শন — প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল।

৪. ভারতীয় দর্শন — জগদীশ্বর সান্যাল।

৫. ভারতীয় দর্শন — নীরদবরণ চক্রবর্তী।

৬. Outlines of Indian Philosophy – M. Hiriyanna.

৭. ন্যায় দর্শন — ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

৮. বেদান্ত দর্শন — উদ্বোধন কার্যালয়।

৯. Google.

অনুরাগের কথা

সোমা সরকার

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

'অনুরাগ' কথাটি ছোট হলেও শুনতে মধুর। যার গভীরতা অনেক। যেখানে আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-প্রীতি, পছন্দ, বন্ধুত্ব, আকর্ষণ, মনের টান সবটাই লুকিয়ে আছে।

কারও কারও অনুরাগ রয়েছে তার নিজের শিল্প ও নৃত্যকলার প্রতি। যাকে পাওয়ার জন্য নিজের জীবনটাও হাসতে হাসতে উৎসর্গ করতে পারে। যেখানে এতটাই প্রেম লুকিয়ে। আবার কেউ কেউ রয়েছেন পশু-পাখিদের প্রতি অনুরাগী। যেখানে কোনও কষ্টই কষ্ট নয়, কোনও পরিশ্রমই পরিশ্রম নয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটনির পর তার পোষ্য পাখি, কুকুর, বিড়াল বা অন্য যেকোনো পশু যাকে সে আদরের নাম দিয়ে থাকে, তাকে কিছুক্ষণ বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে পরম তৃপ্তি লাভ করে।

আবার কারও কারও অনুরাগ রয়েছে তাঁর ভালোবাসার মানুষকে ঘিরে। সমস্ত ভাবনা, চিন্তা, স্বপ্ন সবটাই যেন তার ভালোবাসার মানুষকে জড়িয়ে রয়েছে। হতে পারে সেই মানুষটি তার খুব কাছের অথবা দূরের কেউ। তবুও মন তাকেই খুঁজে ফেরে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা ক্ষণে। অর্থাৎ মানুষ যেখানে অমৃতের স্বাদ পায় সেখানেই ছুটে যায় বারবার। মানুষ তখন ভাবতেই পারে না যে তার পেছনে কী আছে, এমন সুখ সে কতদিন টিঁকিয়ে রাখতে পারবে।

বর্তমান দুনিয়াটা আধুনিক থেকে আরও আধুনিকতার দিকে ছুটে চলেছে। যতটুকু স্বাধীনতা প্রয়োজন তার তুলনায় স্বাধীনতা ভোগ-বিলাসিতা বেড়ে গেছে। তলিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ, স্নেহ-মায়া-মমতা। কারও পাশে বসে দুটো কথা বলার সময়টুকুও কমে এসেছে। এক টেবিলে খাওয়া গল্প-আড্ডা এসব এখন কল্পনা মাত্র। নতুন কোন গল্পের বই, ম্যাগাজিন, কবিতা নাটকের বই হাতে নিয়ে বসে পড়ার মতো ধৈর্য্য ও সময়টুকুও মানুষের হাতে আর নেই। তবে খুব কম মানুষই আছে যারা গল্প, কবিতা ও নাটক এসব লেখা বা পড়ার অনুরাগী।

একদিকে বেকারত্বের জ্বালা অন্যদিকে সমাজের মানুষের পরনিন্দা-পরচর্চা মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিয়েছে। কর্মে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে অপমান ও তিরস্কারের মাত্রা বেড়ে গেছে। মানুষ নিজের স্বার্থকে গুছিয়ে নিতেই ব্যস্ত।

'ভেবোনা কেউ না থাক আমি তোমার পাশে আছি' এই কথাটা বলার মত মানুষটিও হারিয়ে গেছে।

তাই অনুরাগের রঙটিও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এসেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলের জায়গায় বেড়েছে লড়াই; বন্ধুর মধ্যে বিশ্বাসের জায়গায় অবিশ্বাস; একতার জায়গায় একাকিত্ব; স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার জায়গায় বেড়েছে সন্দেহ। এর জন্য আমরা কাকে দায়ী করবো?

এই সমাজটাকে, নাকি মানুষ তার নিজেকেই, নাকি সমাজের গোটা সিস্টেমটাকে? যাকেই দায়ী করা হবে সেই চোখ রাঙিয়ে রক্ত জবা হয়ে উঠবে। তাহলে কি এইভাবেই অনুরাগ তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলবে, নাকি নতুন রঙ তুলির টানে সুসজ্জিত করে তোলা হবে?

ভাবনাটা শুধু মানুষের।

এক তরফে নয় উভয় তরফেই ভাবতে হবে। তাই গর্জে নয় জেগে ওঠাই হল বিচার বিবেক ও বুদ্ধিমান মানুষের কাম্য।

সোনালী মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি

সুদীপা সরকার, ষষ্ঠ সেমেস্টার

(বাড়ির বারান্দায় একটা কাঠের চেয়ারে বসে চিরন্তন দা নিজের অতীতের কিছু স্মৃতিচারণা করছেন..)

সময়টা ছিল ২০১৬, আমি তখন ক্লাস ১১ এ পাঠরত।মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই Science নিয়েছিলাম, জানতাম না যে Science এ টানতে পারবো কি না... কিন্তু মনের মধ্যে ছোট্টবেলা থেকে একটা সুপ্ত ইচ্ছে কোথাও যেন লুকিয়ে ছিল যে আমি Science নিয়েই পড়ব আর সেই ইচ্ছেই আমাকে আমার পথ নিশ্চিত করে দেয়।

আমাদের বিদ্যালয়টি স্বাধীনতার কিছু সময় আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৭০ বছর পরেও বিদ্যালয়ের দিকে তাকালে একবারের জন্যও মনে হবে সেই আদিম ঐতিহ্যের এক কঠোর বেড়াজালের মায়া থেকে সেটি বোধহয় আজও বেরোতে পারেনি। অবশ্য এতোগুলো বছর কাটিয়ে আসলেও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো বা শিক্ষার দিক থেকে খুব একটা উন্নতি হয়নি। আমাদের সেই বিদ্যালয়ে একজন গণিতের শিক্ষক ছিলেন তাঁর নাম বিভূতি ভট্টাচার্য। তাঁর গণিতে পারদর্শিতা ছিল প্রবল এবং বিনয় আচরণের জন্য তিনি আমাদের সবচেয়ে কাছের একজন প্রিয় শিক্ষক ছিলেন।

আমাদের Science students দের একটা group ছিল আর সেই group এর ৮ জনের মধ্যে ৫ জনই বিভূতি মশাইয়ের কাছে প্রাইভেট পড়তে যেতাম। আমার বাকি সকল বন্ধুদের চেয়ে আমিই কিছুটা আলাদা ছিলাম— শান্ত, একাকী এবং চুপচাপ, তাদের কথায় তাল মিলিয়ে চলতে পারতাম না, তাদের সাথে ঠিকভাবে কথাও বলতে পারতাম না, তাই কালক্রমে ধীরে ধীরে তাদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম।

আমরা বিকেলের পড়ন্ত রোদে ৫.২০তে ট্রেন ধরতাম আবার পড়া হয়ে গেলে বাড়ি চলে আসতাম। সকল বন্ধুদের সাথে একসাথে যাওয়া আসাটা আমি খুব একটা পছন্দ করতাম না তাই আমি নিজের একাকীত্বের ভাব কাটানোর জন্য সেই ট্রেনযাত্রার বেশিরভাগ সময় অন্য কোনো কামরায় বসে বই পড়তাম। একদিন আমি ট্রেনে করে পড়তে যাচ্ছিলাম। সেদিন বোধহয় আমার বন্ধুরা কেউই যাচ্ছিল না। আর আমি ট্রেনের কামরার জানালার ধারে Biology-র কঠিন সব পড়াগুলো বোঝার চেষ্টা করছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল আমার চোখের আড়ালে কেউ যেন আমায় দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে দেখছে, অবশ্য আমি তার দিকে

তাকানোর প্রয়োজন তখনও বোধ করিনি। হঠাৎই আমার পাশের জন উঠে যাওয়ায় সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি আমার পাশে এসে বসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে "তুই বইয়ের এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারছিস না? আমি বুঝিয়ে দেবো?"

আমার কোনো কিছু বোঝার আগেই সে আবার আমাকে জিজ্ঞেস করে বসে "তোর বাড়ি কোথায়?"

তখন নিজের অজান্তেই তার দিকে চেয়ে দেখি একটা ২৪-২৫ বছর বয়সী মেয়ে, গায়ের রঙ দুধের মতো ফরসা, রোগা এবং তার মুখের চাউনি খুবই মায়াবী।প্রথমবার একটা অজানা ব্যক্তিকে নিজের পরিচয় জানাতে একটু সংকোচ বোধ করছিলাম আর সেই মুহূর্তেই আমার স্টেশন এসে পড়ায় আমি নেমে যাই।

এই ভাবে পরের দুইদিন তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম অবশ্য কোনো কথা হয়নি।আবার কিছু দিন পর সেই মেয়েটি এবার আমার পাশেই এসে বসে এবং আমাকে জিজ্ঞেস করে - 'তুই এমন চুপচাপ বসে থাকিস কেনো? আমাকে বল... আমি তোকে অনেকদিন ধরেই খেয়াল করছি।'

তার কথা শুনে মনে হয়েছিল সে হয়তো খুব একটা খারাপ না, তার সাথে কথা বলাই যায় আর এই ভেবে তখন আমি প্রথমবার তার সাথে কথা বলেছিলাম।তার ব্যবহার ও আচরণ এতোটাই সুন্দর, নম্র এবং বিনয়ী যে ট্রেন থেকে নামার পরেও তার কথা আমার মনে দীর্ঘ সময় ধরে বর্তমান ছিল। তারপর থেকে আমি রোজই তার সাথেই ট্রেনে করে যেতাম। হঠাৎ একদিন আমি তাকে জিজ্ঞেস করে বসলাম "দিদি তুমি রোজ কোথায় যাও এই ট্রেনে করে? আর তোমার বাড়ি কোথায়?"

তখন আমি জানতে পারলাম সে একজন নার্স এবং তার বাড়ি আমার বাড়িরই কাছে গঙ্গার ওপারে।সেও জানায় তার বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন তাই সে এবং তার মা একসাথে থাকে। তার একটি দিদি আছে এবং তার বিয়েও হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই।

এই সব বলতে বলতে তার দুচোখ জলে ভরে আসছিল আর নিজের অজ্ঞাতসারেই আমার হাত দুটো তার চোখের জল মোছার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তার সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম; সে কে? কেনোই বা তার সাথে আমি এতো কথা বলি-একটি বারের জন্যও আমার মনে আসেনি।

কিছুদিন যাওয়ার পর অনেক সাহস করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম "দিদি তোমার নাম কী?"

তার সদুত্তরে সে বললো "এতদিন ধরে আমার সাথে কথা বলছিস আমার নাম জানিস না? — মৌমিতা।" অবশ্য আমার মনের মধ্যে অনেকবারই এসেছিল এই প্রশ্নটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

একদিন সে আমায় ভাইফোঁটার দিন তার বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায় আর তার কথা মতো ভাইফোঁটার দিন সকাল সকাল স্নান করে তার বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দিই। নৌকা থেকে নামার পরই দেখতে পাই সে একটি ভগ্নপ্রায় সাইকেল নিয়ে আমার জন্যই প্রতীক্ষা করছে।

তারপর সে আমাকে তার সাইকেলে বসিয়ে তার বাড়ি নিয়ে যায়। তার বাড়িটি মেন রোডের পাশের এক দীর্ঘ গলির শেষে চারপাশ উঁচু দেওয়ালে ঘেরা আর বাড়ির আঙিনায় একটি বিরাট দরজা। ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমি সোফার ওপরে গিয়ে বসি এবং ঘর থেকে তার মা আমার জন্য সরবত নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমবার এক অজানা ব্যক্তির বাড়িতে এসে একটু ইতস্তত বোধ করছিলাম আর সেই মুহূর্তেই তার মা আমাকে এসে বললেন "তোমার কথা মৌমিতা রোজ আমাকে এসে বলে; ওর নিজের কোনো ভাই নেই আর কদিন আগে ওর বাবাও মারা গেছেন... শোকে তাপে অনেকদিন নিজেকে ঘর বন্দি করে রেখেছিল, আমিই ওকে জোড় করে চাকরিতে পাঠাচ্ছি, আর ও ছোটো থেকে ভাই ভাই করে পাগল তাই তোকে ও নিজের ভাইয়ের চোখেই দেখে।"

কথাটা শুনে আমার মনের মধ্যে তার প্রতি খুব মায়া অনুভব হচ্ছিল আর তখনই মনের ভেতর থেকে একটা অন্য প্রেরণা জেগে উঠলো যে সে যদি আমায় তার ভাইয়ের মতো ভালোবাসতে পারে আমি তাকে কেনো দিদির মতো ভালোবাসবো না, আজ আমার যদি কোনো দিদি থাকতো সেও হয়তো আমাকে এতোটা খেয়াল রাখতো না।

ঠিক তার পরের মুহূর্তে সে আমার কপালে ভাইফোঁটা তুলে দেয় এবং উপহার হিসেবে একটা বড়ো চকলেটের সেট দেয়। আমি অবশ্য ছোটো ছিলাম তাই আমিও তার হাতে ২০ টাকা দিই কিন্তু সে সেটি প্রত্যাখ্যান করে। সেই সূক্ষ্ম মুহূর্তের জন্যও আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমার দেওয়া টাকাটি তার আয়োজন বা উপহারের থেকে নগণ্য তাই সে হয়তো আমাকে উপহাস করবে কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই সে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে তার কোনো কিছুই লাগবে না। আমি ভালো করে পড়াশোনা করি, মানুষের মতো মানুষ হই আর সারাজীবন সুখে দুঃখে সে যেনো আমায় পাশে পায়— এই কথা দেওয়াটাই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো উপহার।

সেদিন একটা বিয়ে বাড়ির খাওয়ার অনুষ্ঠানের থেকেও বেশি রকমের খাবারের আয়োজন হয়েছিল। এভাবে ভাইফোঁটা, রাখি বন্ধন ছাড়াও বিভিন্ন পুজোতে ঘুরতে যাওয়া, কেনাকাটা

করতে যাওয়া সব জায়গায় আমি তার ভাই হয়ে তার পাশে পাশে থাকতাম। আমার ভালোলাগা, খারাপ লাগা থেকে শুরু করে সবকিছুর সে খেয়াল রাখতো।

এক একদিন প্রাইভেট না থাকলেও বাড়িতে মিথ্যে বলে তার কাছে যেতাম আর সময় কাটাতাম। আমার থেকে ৮-৯ বছরের বড়ো হলেও মারপিট, কান্না, গল্প, ঘুরতে যাওয়া সব সময়ই চলতো তার সাথে।

এক দুদিন দুজনে ঝগড়া করে কেউ কাউকে কল করতাম না কিন্তু বেলা শেষে সেই আমার রাগ ভাঙাতো। ধীরে ধীরে মনে হতো সে না থাকলে আমি কিভাবে বাঁচবো; কারণ সে আমার শুধু দিদিই না সে আমার কাছে ছিল একজন পথের দিশারী। তার কাছ থেকেই প্রথমবার অসহায় মানুষদের সাহায্য করা, কারোর বিপদে এগিয়ে আসা, জীবনে সততার পথ বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে জীবনের প্রত্যেকটা ধাপ চলার অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছিলাম।

সবই ঠিক চলছিল, হয়তো এতো সুখ তার কপালে ছিল না। হঠাৎই তার মা মারা যায় এবং সে আরও একা হয়ে যায়। আমার পরীক্ষা থাকার জন্য সে আমাকে একবারও তা জানতে দেয়নি, আর আমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দেখি সে আগের থেকে অনেক ভেঙে পড়েছে আর আগের মতো সেই সচলতা, আনন্দের লেশ মাত্র নেই তার মধ্যে।

আমি তার দুহাত মুঠো করে ধরে তার ভরসা জোগানোর চেষ্টা করি যে আমি তার পাশে আছি, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার কাছে আমার বলা সবকিছু যেন বৃথা।সেই দুর্বল, অসার শরীর নিয়ে চাকরিতে যেত শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচানোর জন্য। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম তাকে বোঝানোর কিন্তু সে আর আগের মতো ছিল না।

অনেক বুঝিয়ে তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই, আবার আগের মতো সব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি আর ধীরে ধীরে সে আগের মতো হাসি-খুশি হতে থাকে। তার সেই মুখের হাসির জন্য আমরা কজন মিলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অসহায় গরীব বাচ্চাদের খাবার, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, কিছু বৃদ্ধ মানুষদের সরকারি বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে এসেছিলাম।

তার কিছু দিন পর দুইদিন ধরে তার কোনও খবর পাইনি। অনেকবার ফোন করেছিলাম কিন্তু তার কোনও খবর পাইনি। অনেক চিন্তা, ভয় নিয়ে তার বাড়িতেও যাই কিন্তু সকলেই বলেন কেউই তাকে দেখেনি। তার কিছুদিন পর আমার কাছে হঠাৎ করে কোনো একটি সরকারি হাসপাতাল থেকে ফোন আসে যে আমার সেই দিদি আর জীবিত নেই, সে কোনও একটি রোগে মারা গেছে।

সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র তার সেই স্মৃতি গুলো ছাড়া আমার কাছে কিছুই ছিল না।আমার মনের ভেতর থেকে একটা কষ্টের গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল।

চোখের জল তখন আর আমার কথা শুনতে রাজি নয়। সে একাই বয়ে চলছিল নিজের ধারায়। আর সেই মুহূর্তেই আমি নিজের জ্ঞান হারাই।

কয়েক ঘণ্টা পর যখন চোখ খুললাম তখন মনের মধ্যে একটা কথাই চলছিল যে কদিন আগেও সে আমার কাছে একজন অজানা ব্যক্তি ছিল আর এই কিছুদিনের মধ্যেই সে আমার কতোটা আপন একজন মানুষ হয়ে গেছে। তার কাছ থেকে জীবনে একটা শিক্ষা অন্তত পেয়েছিলাম যে কাউকে ভালোবাসার জন্য রক্তের সম্পর্ক লাগে না, নিজের শিক্ষা, জ্ঞান, ব্যবহার ও আচরণই যথেষ্ট একটা সম্পর্ক গড়তে।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছেন যারা লোভ, প্রতিহিংসা, জাতিভেদ, দাম্ভিকতায় নিজেকে আজও বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিয়েছেন সাধারণ জনজীবন থেকে। তাদের অর্থ, অহংকারের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, মানবিকতা আজ শেষ হতে চলেছে। আবার সমাজে এমনও মানুষ আছেন যাদের হয়তো পুঁথিগত শিক্ষা নেই কিন্তু তাঁরাও অন্যকে প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসতে বা সম্মান দিতে জানেন, তাদের কাছে রক্তের সম্পর্কের থেকেও ভালোবাসা, মানবিকতা অনেক বড়।

আর আমরা সেদিনই নিজেদের গর্বিত বোধ করবো যেদিন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে নিজেদের লোভ, হিংসে, অহংকার সব ভুলে স্বার্থহীন ভাবে একে অপরের পাশে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবো।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত এই গল্পটি)

রুশোর রাষ্ট্রচিন্তা

রাণা বর্মন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

জাঁ জ্যাক রুশো সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম ১৭১২। মৃত্যু ১৭৭৮।

১৭৬২ সালে রুশোর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'এমিল' ও 'সোস্যাল কনট্র্যাক্ট'। 'এমিল' গ্রন্থটি রুশোর শিক্ষাচিন্তার ফসল। সভ্যতা-বিরোধী, আনুষ্ঠানিকতা-বিরোধী মানুষ যেভাবে সভ্যতাকে দেখেন, রুশো শিক্ষাকে সেইভাবেই দেখেছেন। রুশোর দৃষ্টিতে প্রকৃতিই হল একমাত্র শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এই 'এমিল' গ্রন্থে রুশো ধর্ম সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন।

রাষ্ট্র-সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় রুশোর 'দ্য সোস্যাল কনট্র্যাক্ট' গ্রন্থে। রুশোর এই গ্রন্থে যে আবেগ ও উত্তেজনা লক্ষ করা যায়, অন্য গ্রন্থে তা যায় না। এই গ্রন্থের শুরুতে রুশো বলেছেন, "মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায় এবং তারপর সে দেখে, সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত" তারপরেই বলেছেন "কীভাবে এমন হল আমার জানা নেই।" রুশোর এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের স্বাধীনতা অবাধ নয়, বরং তা নিয়ন্ত্রিত।

রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ন্যায়-পরায়ণ ছিল না, নীতি-বিরোধীও ছিল না, কিন্তু অনৈতিক ছিল। তিনি প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে মহান বন্য জীব বলে চিহ্নিত করেছেন। পাপপুণ্য, ভালো-মন্দ বিচারের প্রশ্ন প্রকৃতির রাজ্যে ছিল না। মানুষ সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্য ভোগ করত। মানুষের লক্ষ্য ছিল তার প্রাথমিক চাহিদার প্রয়োজন মেটানো। অর্থাৎ কোনও লোভ প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে এই প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য ধ্বংসের দিকে এগিয়েছিল যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। রুশোর মতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কৃত্রিম অধিকার হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ প্রকৃতির রাজ্যকে অসাম্য, শোষণ ও বঞ্চনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে। তিনি বলেন সম্পত্তি সৃষ্টির ফলে কেবল বৈষম্য সৃষ্টি হয়নি, সেই সঙ্গে মানুষের অহংবোধও জেগে উঠতে থাকে। এই অহংবোধই মানুষের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

প্রকৃতির রাজ্যে শান্তি যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল, অর্থনৈতিক উন্নতি ও কৃত্রিমতার ফলে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা হারিয়ে কৃতদাসে পরিণত হল। তার ফলে অশান্তি ঘনিয়ে এল। মানুষ তখন ঐক্যবদ্ধভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি চুক্তি সম্পাদন করে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তুলল। রুশো এটিকে সামাজিক চুক্তি বলেছেন।

রুশো বলেছেন, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে যে মিলিত শক্তি গড়ে উঠেছিল, তাই হল সাধারণ ইচ্ছা। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকে সকলের কাছে নিজেকে অর্পণ করেও কোনও ব্যক্তি অপর

কারোর অধীনস্থ হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ চুক্তি সম্পাদন করে সার্বভৌম 'সাধারণ ইচ্ছা'র হাতে তাদের ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। এই ইচ্ছা সকলের শুভ ইচ্ছার সমষ্টি।

রুশো তাঁর 'সোস্যাল কনট্র্যাক্ট' গ্রন্থে সার্বভৌমিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সার্বভৌমিকতা অহস্তান্তরযোগ্য। সার্বভৌমিকতা জনসাধারণের ইচ্ছার পরিচালনা ছাড়া আর কিছু নয়। আর ইচ্ছাকে কখনোই হস্তান্তর করা যায় না। সার্বভৌমিকতা হলো সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব মাত্র। এখানে তাই রুশো সার্বভৌমিকতাকে অবিভাজ্য বলেছেন। অর্থাৎ সার্বভৌমিকতাকে ভাগ করার অর্থ হলো তা ধ্বংস করা।

Sorojini Naidu : Nightingale of India

Pinki Roy, Poltical Science Hounours, Fourth Semester

Sargini Naidu, nee Sarojini Chattopadhyay, (born February, 13, 1879, Hyderabad, India- died March 2 1949, Lucknow), political activist, feminist, poet, and the First Indian Woman to be president of the Indian National Congress an to be appointed and Indian State Governor. She was sometimes called "The Nightinagle of India". Sarojini was the eldest daughter of Aghorenath Chattopadhyay, a Bengali Brahman, who was the, principal of the Nizam's College, Hyderabad. At the age of 12 she entered the university of Madras and studied (1895-98) at king's college, London and later at Girton College, Cambridge. After some experience in the suffragist campaign in England, she was drawn to India's Congress movement and to Mahatma Gandhi's Non-Cooperation Movement. In 1924 she traveled in eastern Africa and South Africa in the interest of India's there and the following year became the First Indian woman president of the National Congress having been preceded eight years earlier by the English Feminist Annie Besant She toured North America, lecturing in the Congress Movement in 1928-29. Back in India her anti-British Activity brought her a number of prison sentences (1930,1932, and 1942-43). She accompanied Gandhi to London for the inconclusive second session of the Round Table Conference of Indian British Cooperation (1931).

Upon the outbreak of World War II. She supported the congress party's policies first to aloofness them of avowed hindrances to the Allied cause. In 1947 she became governor of the United Provinces, a post she retained until her death. Sarojini Naidu also led an active literary life and attracted notable Indian intellectuals to her famous Salon in Bombay Her first volume of poetry, "The Golden Threshold", was followed by the 'Bird of time', and in 1914. She was elected a fellow of the Royal Society of Literature. Her collected poems, all of which she wrote in English, have been published under the tilles, 'The Sceptred Flute' and 'The Feather of the Dawn'. University of Madras, stated controlled institution of higher learning located in Madras, India. One of three affiliating Universities founded by the British in 1857, Madras has developed as a teaching and research instition since the 1920's. By the mid-1970s the University comprised 11 post graduate faculties and 22 constituent colleges and was the examining and degree-granting authority for 149 affiliated colleges through out the state of Tamil Naidu. It is a national centre for advanced research in plant pathology, mathamatical physics, biophysics, and Indian philosophy Instruction is in English and Tamil.

বীরাঙ্গনা কাব্যে পুরাণ - প্রভাব

সুস্মিতা বারিক, সাম্মানিক বাংলা, চতুর্থ সেমেস্টার

পুরাণ হলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত এক শ্রেণীর ধর্মীয় সাহিত্য। বিভিন্ন দেবদেবীর মহিমা এবং বিভিন্ন রাজবংশের গরিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল। সংস্কৃতে রচিত এই গ্রন্থ গুলির প্রভাব ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যে গভীরভাবে পড়েছিল। যেমন বাংলা সাহিত্য তার শৈশব থেকেই পুরাণ-সৃষ্ট। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরাণের যে অধিগ্রহণ, তা অনুসৃত হয়েছে আধুনিক সাহিত্যেও। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখছি। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলার এই প্রথম পত্র কাব্যে মধুসূদন রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত নাটকের থেকে ১১ জন নায়িকাকে বেছে নিয়েছিলেন। সেই নায়িকারা চিঠি লিখেছেন তাঁদের স্বামী বা প্রেমিকের উদ্দেশে।

'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম পত্র। এই পত্রের কাহিনীর উৎস 'মহাভারত' এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক। মহাভারত ও কালিদাসের নাটক থেকে জেনেছি রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করে তাকে কন্বমুণির তপোবনে রেখে স্বরাজ্যে ফিরে যান। ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দীর্ঘদিন ধরে পত্নীর কোনো খবর নেননি। কালিদাস তাঁর নাটকে দুর্বাসার অভিশাপ নামক কল্পিত ঘটনার মাধ্যমে দুষ্মন্তের ঔদাসীন্যতাকে কিছুটা আড়াল করেছিলেন।

কিন্তু মধুসূদন তাকে গুরুত্ব দেননি। বরং রাজার এই ঔদাসীন্য নিয়ে উপেক্ষিতা নারী হৃদয়ের যন্ত্রণা ও উদ্বেগ থেকেই শকুন্তলাকে দিয়ে পত্র রচনা করিয়েছিলেন। মাইকেল তাঁর কাব্যে দুর্বাসার অভিশাপ-এর কল্পিত ঘটনাকে উপেক্ষা করেছেন। শকুন্তলা স্বামীর এই চূড়ান্ত অবহেলা সত্ত্বেও দাসী হয়ে স্বামীর পদসেবা করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। কাব্যে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার আশ্রয় নিয়েছিলেন মধুসূদন। মাইকেলের শকুন্তলা বাকপটু। সে নিজেই নিজের অসুবিধার কথা জানাতে পারে। এই পত্রে শকুন্তলাকে মাইকেল স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছেন।

দ্বিতীয় প্রেমপত্র হলো 'সোমের প্রতি তারা'। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে তারা হলেন সাধ্বী রমণী। চন্দ্রদেবের প্রেমাকাঙ্ক্ষার উত্তরে শোনা যায় তারার রোষদীপ্ত তিরস্কারপূর্ণ বাক্য। চন্দ্রদেব কামাসক্ত হয়ে জোর করে তারাকে সম্ভোগ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু দেবীভাগবত পুরাণে চিত্রটি একেবারেই অন্যরকম। এখানে গুরুপত্নী তারা চন্দ্রের প্রতি প্রেমবিবশা হয়ে পড়েন এবং নিজেই সোমের কাছে প্রেম নিবেদন করেন। একপ্রকার এই কাহিনী অনুসরণেই মাইকেল 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকাটি লেখেন। তারা বিবাহিতা এবং সোমের গুরুপত্নী। তা সত্ত্বেও অসংকোচে প্রেমপত্র লিখেছেন সোমকে। বিবাহোত্তর প্রেম নিষিদ্ধ জেনেও সন্তানসম শিষ্য সোমের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্তা হয়েছেন। সেই জন্যই আশঙ্কিতা নায়িকা তারার পত্রিকা আমাদের কাছে চির আধুনিক হয়ে উঠেছে।

'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' পত্রটির রচনায় মাইকেল রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করেছিলেন। কৈকেয়ী রাজা দশরথের অন্যতমা স্ত্রী ও অযোধ্যার রানী। দাসী মন্থরার প্ররোচনায় রামের অভিষেকের খবরে কৈকেয়ী হিংসাগ্রস্ত হন। মন্থরা মনে করিয়ে দেয় একবার রাজা দশরথ সম্বর নামক এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে দারুণভাবে আহত হলে কৈকেয়ী তাকে সেবার দ্বারা সুস্থ করে তুলেছিলেন। তখন দশরথ তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো অভাব না থাকায় তিনি নেননি। মন্থরা মনে করিয়ে দেয় যে সেই বর চাওয়ায় সময় এখন এসেছে। তিনি যেন প্রথম বরে ভরতকে সিংহাসনে বসান এবং দ্বিতীয় বরে রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠান।

মধুসূদন তাঁর এই কাহিনীর প্রেক্ষাপট নির্মাণে স্বতন্ত্রতা দেখালেন। মধুসূদন তাঁর এই কাহিনীর প্রেক্ষাপট নির্মাণ করলেন কিছুটা এইভাবে। কোনো একসময় রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর গর্ভজাত পুত্রকেই যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু কালক্রমে দশরথ সেই প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মিত হন। তিনি কৌশল্যানন্দন রামকে সেই পদ প্রদান করেন। দাসী মন্থরার মুখে এ সংবাদ শুনে দেবী কৈকেয়ী রাজা দশরথের উদ্দেশে পত্র লেখেন। মধুসূদনের কৈকেয়ী হয়ে উঠেছেন এক অনবদ্য প্রতিবাদী নারী চরিত্র। কৈকেয়ীর চরিত্রে রয়েছে সত্য-ভাষণের দৃপ্ত তেজস্বিতা এবং স্বামীর সত্যরক্ষার প্রতি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা আছে ঠিকই কিন্তু স্বামীর এই অকর্মকে তিনি মেনে নিতে পারছেন না।

বীরাঙ্গনা কাব্যে 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রটি কাহিনীসূত্রে কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে গৃহীত। মাহেশ্বরী পুরীর যুবরাজ প্রবীর অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরলে অর্জুন তাকে যুদ্ধে নিহত করেন। রাজা নীলধ্বজ প্রথমে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেও পরে জামাতা অগ্নির পরামর্শে যুদ্ধ থেকে বিরত হন। অর্জুনের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। পুত্রহত্যাকারী অর্জুনকে মাহেশ্বরীপুরীর রাজসিংহাসনে বসিয়ে আনন্দোৎসবে মত্ত হন। মহাভারতের জনা স্বামী নীলধ্বজের সঙ্গে অর্জুনের বন্ধুত্ব মানতে না পেরে প্রতিবাদে গর্জন করেছিলেন।

মধুসূদন এ কাহিনীর অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু নিজস্বতা হল জনার চরিত্রে উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রকাশ ঘটানো। মধুসূদন এই পুরাণপ্রতিমাকেই তাঁর কাব্যের নায়িকা করেছেন। মহাভারতের মতো একমুখীন প্রতিবাদী নয়; ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে, প্রতিবাদে, বিলাপে জনা এক রক্তমাংসের মানুষ। নীলধ্বজকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও মননকে কাজে লাগিয়েছেন মধুসূদনের জনা। পরিপার্শ্ব-সচেতন, যুক্তিবাদী, ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই জনা একান্তভাবেই মধুসূদনের সৃষ্টি।

আমরা দেখলাম, বাংলার অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি মধুসূদন প্রাচীন পুরাণ থেকে কাহিনীর কাঠামো গ্রহণ করলেও তাঁর নিজস্বতা দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন প্রত্যেকটি আধুনিক প্রতিমা। এই প্রবণতা বর্তমান বাংলা সাহিত্যেও লক্ষণীয়। তাই পুরাণ যতই পুরানো হোক না কেন সাহিত্যিকদের হাতে তা প্রতিনিয়ত নূতন হয়ে উঠেছে।

গানের ভূমিকা

অঙ্কিতা ব্যানার্জী

চতুর্থ সেমেস্টার, সাধারণ বিভাগ

মানুষের মধ্যে হাজার রকমভাবে সমস্যা যখন তৈরি হয়, তখন আমরা গানটাকে নিজের মধ্যে আলাদা ভাবে অনুভব করতে পারি। করতে-করতে আপনা হতেই নিজেদের মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আসে। গানকে আমরা নিজেদের প্রিয় বন্ধু মনে করি। হ্যাঁ, গান আমাদের অনেক কিছু শেখায়, অনেক কিছু করায়, কিন্তু গানের মধ্যে একটা আলাদা আনন্দও আছে। গানকে আমরা সারাদিন সারারাত যেভাবে চাই, সেই ভাবেই গাইতে পারি। আচ্ছা, আমাদের প্রথম গান শেখা কার কাছে, মনে পড়ে? হ্যাঁ। যখন মা রান্নাঘরে বসে কোনও পুরনো দিনের গানের কলি গুনগুন করতে থাকে আর আমি তার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, তখন মনে হয়, আহা! কী সুন্দর গানটা! আমিও যদি গাইতে পারতাম! অন্য সময়ে গানটাকে সাধারণ মনে হলেও মা যখনই গায়, তখনই সেটা অসাধারণ হয়ে ওঠে।

গানের মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, আছে একটা আত্মপ্রশান্তি। গান এমন একটা শব্দমালা যেটা মানুষকে একটা আলাদা উত্তরণ দেয়। মানুষকে আমরা গানের মধ্য দিয়ে আলাদাভাবে চিনতে এবং বুঝতে পারি। আচ্ছা, আমরা তো বড় হয়েছি। আমরা কি সবাই সবাইকে সব কিছু বলতে পারি? পারি না। সেইসব না বলা বাণী প্রকাশ করা যায় গানের মাধ্যমে।

বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে কত গান আছে। এছাড়াও আছে অন্যান্য ভাষার অগণিত গান। যে-কোনও ভাষায় যে কেউ গান করতে পারেন। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। তাই বাংলা গানকে আমরা সর্বাধিক ভালোবাসি। বাংলা গানের মধ্যে যে বিস্তার এবং আনন্দ আছে, তা আর কোনও ভাষার মধ্যে আছে কি? বাংলা গান তথা বাংলা ভাষাকে আমরা নিজেদের প্রাণ মনে করি। এই ভাষায় গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল -- আরও কত কবি।

গান কিন্তু সবার কাছে ব্যবসা নয়। গান একটা আবেগ। কেউ হারমোনিয়ামে গান করে, কেউ গিটার নিয়ে। কেউ-বা খালি গলায় গুনগুন করতে-করতে গান গায়। আমার ছোটবেলায় -- মনে আছে -- আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল আমাকে গান শেখাবে। সেজন্যই বাবার ইচ্ছাতে আর কিছুটা নিজের ভালোবাসায় গান শিখতে শুরু করি। বছরের পর বছর গেল। আজ যখন আমি গান করি, তখন মনে হয় যেন জীবনে আমি একটা আলাদা শান্তি পাই। গানকে আমি আমার প্রিয় বন্ধু হিসেবে মনে করি, যাকে আমি কোনওদিন ছাড়তে পারবো না।

গান সবার মধ্যেই আছে। কেউ গাইতে চায় আবার কেউ লজ্জা পায়। আমরা যেমন গাইতে পারি, তেমন অনেকে আছে যারা গান শুনতে ভালোবাসে। গান যেমন বহুপ্রকার, তেমন গানের শ্রোতাও অনেক রকম। গানকে আমরা কোনওরকম ভাবেই বাজে বা ছোট কিছু মনে করতে পারি না। গানের কথা ও সুর মানুষকে বাঁচায়। গান মানুষকে আনন্দ দেয়, আবার কষ্ট থেকেও মানুষকে তুলে আনে। এমনই হচ্ছে আমাদের গান।

মোহরাত্রি

ড. প্রসেনজিৎ বসু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

॥ এক ॥

অবশেষে বসুদেব শিশুপুত্রকে কোলে আঁকড়ে গোকুলে এসে পৌঁছলেন।

সারা জীবনের যত বিস্ময়, সব একত্র করলেও বুঝি আজকের রাতের তুলনা হয় না! একের পর এক ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে। সেগুলির ক্রমিক অভিঘাতে নিজেকে এখন ঘোরলাগা মানুষ মনে হচ্ছে তাঁর। যা ঘটছে, তা সত্য? না স্বপ্ন? নাকি এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে অন্যতর কিছু?

কারাগারে প্রসবপীড়া উঠল দেবকীর। গতবারের গর্ভপাতটি বাদ দিলে এই নিয়ে সপ্তম বার। কিন্তু অন্যবারগুলির তুলনায় এবার সবই অদ্ভুত। সন্তানজন্মের ঠিক পরেই... সেই নির্মল আনন্দমুহূর্তে... কী আশ্চর্য... দুজনেই যেন নিদ্রামগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন। যেন বহুকাল পর জেগে উঠলেন বসুদেব। দেবকী তখনও সুষুপ্ত। মাঝখানের এই সময়টুকুতে যেন কতকিছু ঘটে গেছে! কতজন এসে যেন কতকিছু বলে গেছে! কতকিছু করে গেছে! কিছুই মনে পড়ে না বসুদেবের।

শুধু একটি কথা ছাড়া। "গোকুলের নন্দঘোষের গৃহে পুত্রটিকে রেখে কন্যাটিকে নিয়ে এসো, বসুদেব।"

এ উক্তি কার, এ আদেশ বা উপদেশ বা অনুরোধ কার -- বসুদেব কিছুতেই মনে করতে পারেন না। শুধু এটুকু বুঝতে পারেন, এ বাক্য অমান্য করা যায় না। তাঁর নিজের হাতে বোনা ছোট্ট একটি কাঁথায় ছেলেটিকে মুড়ে ইতিউতি তাকান।

কারাপ্রকোষ্ঠের লৌহকপাট হাঁ করে খোলা। রক্ষী নিদ্রিত। বসুদেব চৌকাঠ পেরিয়ে যান। পরের ফটকটিও উন্মুক্ত। তার পরেরটিও। তার পরেরটিও। তার পরেরটিও। বসুদেব মনে মনে ভাবেন, কারা-পর্যবেক্ষক পরিদর্শনে এসেছিল। তার প্রত্যাবর্তনের পর রক্ষীগণ দ্বার রুদ্ধ করতে বিলম্ব করছে বুঝি।

দক্ষিণ ফটকটিতে পৌঁছতেই বসুদেব বিপর্যয়টা টের পান। তুমুল ঝঞ্ঝা! বিষম বজ্রপাত! সঙ্গে মুষলধারে বর্ষণ! পুত্রসহ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মরবেন নাকি? ফিরে যাবেন? নাঃ। এ পথে ফেরা যায় না। ঝড়বাদল মাথায় নিয়ে পথে নামেন তিনি।

পথ গিয়ে শেষ হওয়ার কথা যমুনায়। কিন্তু কোথায় পথের শেষ আর কোথায় যমুনার শুরু — বোঝা অসাধ্য। ভাদ্রের ভরা যমুনা তুমুল বর্ষণে ভেসে গেছে। হাঁটুজলে ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন তিনি।

অকস্মাৎ একটি কর্কশ শিবারব। শৃগাল! এই বিপর্যয়ের রাতে! চারপাশে তাকান বসুদেব। অনতিদূরে একটি ধূসর পশুমূর্তি দেখা যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে সেই পশুর দুচোখে যেন পূর্ণিমার বিভা! শৃগাল নয়, শৃগালী। আরেকবার ডেকে ওঠে সেটি। তারপর যমুনার জলে চারটি থাবামাত্র ডুবিয়ে ছলাৎ-ছল শব্দ তুলে চলতে শুরু করে।

বসুদেব অবাক হতে গিয়েও হন না। পশুপক্ষীর প্রকৃতিপ্রদত্ত কিছু বিশেষ জ্ঞান আছে, তিনি জানেন। বানভাসির পরেও ভরা নদীর মাঝে জেগে থাকে কিছু অদৃশ্য চর। মানুষ না জানুক, পশুরা তার খবর রাখে। যেভাবে পিপীলিকার কাছে থাকে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বসুদেব শৃগালীটির অনুগমন শুরু করেন। দু'পাশে মহাশব্দে বয়ে চলে খরস্রোতা যমুনা। অথচ পায়ের তলায় মাটি পান তিনি। একটিবারের জন্যও পশুটি পিছু ফিরে তাকায় না এবং ওপারে পৌঁছেই ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়।

অবশেষে ছেলেটিকে কোলে আঁকড়ে গোকুলে এসে পৌঁছন বসুদেব।

॥ দুই ॥

নন্দঘোষের গৃহটি বসুদেব চেনেন। পূর্বপরিচয় ছিল। কিন্তু আজকের এই দুর্যোগের রাতে সবই অচেনা ঠেকে তাঁর। তবু জলমগ্ন এপথ-ওপথ বেয়ে একটি সম্পন্ন গৃহের সম্মুখে এসে পৌঁছন তিনি। দ্বার ঠেলে অঙ্গনে প্রবেশ করেন। একদিকে তুলসীর ঝাড়। অন্যদিকে নীল অপরাজিতার লতা। অঙ্গন পার হয়ে কক্ষ। গবাক্ষ দিয়ে দেখা যায়, এক স্ত্রীলোক, নিশ্চয়ই নন্দজায়া যশোমতী, শয্যায় শায়িতা। একটু কুণ্ঠা তো বোধ করেনই বসুদেব। শত হোক, পরস্ত্রীর শয়নকক্ষ! কিন্তু আজকের এই রাতে এমন কত কুণ্ঠা, ভয়, সংশয়কে অতিক্রম করেই তো এই পর্যন্ত এসে পৌঁছনো!

নিঃশব্দে নিমকাঠের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই কেমন যেন চমকে ওঠেন বসুদেব। যশোদার কোমরের কাছে শায়িতা একটি সদ্যোজাতা কন্যা— পূর্ণনগ্না— অপলকে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। যেন তাঁরই আগমনের পথ চেয়ে আছে। ওই একজোড়া চোখের স্থির পূর্ণদৃষ্টিতে কেমন যেন ধন্দে পড়েন বসুদেব। কোথায় যেন দেখেছেন ওই চোখ...

কিন্তু এ কী! কাছে যেতেই আবারও চমক! মেয়েটি সর্বাঙ্গ যে ভিজে একাকার! ছাদের দিকে দৃষ্টি যায় বসুদেবের। ছিদ্র বেয়ে বৃষ্টির জল ঢুকছে নাকি? কই, না তো! যশোমতীর পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ শুষ্ক। তাহলে? তাহলে যাই হোক, পুত্রটিকে যশোমতীর পাশে শুইয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নেন তিনি।

এবং সাথেসাথেই আঁতকে ওঠেন। ছেলেটিকে একদলা ননী মনে হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু ক্ষুদে মেয়েটি যে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার! এত তাপ এই এতটুকু শিশুদেহে! ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে মনে হচ্ছিল, বুকের ভিতর অব্দি জুড়িয়ে যাচ্ছে বুঝি! কিন্তু একে বুকে নিলে যে বুকের ভিতর ভয় ধরে! হৃদপিণ্ড যে কেঁপে ওঠে কার প্রলয়নাচের ছন্দে!

কন্যাসহ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন বসুদেব। আর বেরোনো মাত্রই আকাশজোড়া ঝড়ের দাপট চোখের নিমেষে থেমে গেল। বৃষ্টির শেষ ফোঁটাটুকু টুপ করে ঝরে পড়ল দুরন্ত মেয়ের নাক থেকে খসে পড়া নোলকের মতো। মেঘের চূড়ো থেকে বেরিয়ে এল অষ্টমীর চাঁদ। যেন কার জটাকবরীতে গাঁথা সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকলা।

॥ তিন ॥

প্রশান্ত যমুনা। ভরন্ত, কিন্তু আগের মতো ক্ষিপ্ত নয়। মেয়েটির দেহতাপও যেন খানিকটা সুসহ হয়ে এসেছে। অস্বস্তি জাগানো সেই স্থির চোখও আর নেই। ঘুমিয়েছে বোধহয়। বসুদেব আসার সময়ে নদীতীরের একটি মাধবীকুঞ্জ চিনে রেখেছিলেন। সেখানেই ছিল সেই গোপন নদীচর। অনুমান মতো জলে পা রাখেন তিনি। এগোতে থাকেন।

মধ্যযমুনা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন বসুদেব। চারপাশ নিস্তব্ধ। আরেকটু পরেই হয়ত শেষ হবে এই রোমাঞ্চকর নৈশ অভিযান। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, এ কী করছেন তিনি! নিজপুত্রকে রক্ষার জন্য স্বার্থপরের মতো অন্যের কন্যাকে আহুতি দিতে নিয়ে চলেছেন? ইতোপূর্বে কংস তাঁর ছয়টি পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এই মেয়ের আয়ুই বা তাহলে কতক্ষণ? প্রস্তরবেদিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণত্যাগই কি এই নিরপরাধার নিয়তি! না, তা হয় না। নন্দালয়ে ফিরে যাবেন তিনি। পুত্রের পাশে রেখে আসবেন কন্যাটিকেও। বাঁচুক। দুজনেই বাঁচুক। কাউকেই যেন কারুর প্রাণের বিকল্প না হতে হয়। কংসের প্রকোপ না হয় নিজেরাই সয়ে নেবেন।

গোকুলের দিকে ফিরতে যান বসুদেব। কানে বাজে সেই অমোঘ নির্দেশ। "গোকুলের নন্দঘোষের গৃহে পুত্রটিকে রেখে কন্যাটিকে নিয়ে এসো, বসুদেব।" আর মনের মধ্যে উথালপাথাল করে নিরীহ নিষ্পাপ এই শিশুমুখ। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে পড়েন

তিনি। মনে পড়ে হিতকারী সেই শৃগালীটির কথা। আসার সময়ে চরম সংকটে সে দিশা দেখিয়েছিল। একটিবার... আরও একটিবার যদি দেখা পেতেন তার...

তৎক্ষণাৎ কোলের মধ্যে কী একটা যেন নড়ে ওঠে বসুদেবের। বসুদেব চোখ নামান এবং আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠেন। একটি শিশু শৃগালীকে এতক্ষণ ধরে বহন করছিলেন তিনি! শৃগালীশাবকটি মুহূর্তমধ্যে দুটি জ্যোৎস্নাময় চোখ খোলে এবং বসুদেব বুঝতে পারেন মেয়েটির চোখদুটি কেন তাঁর পরিচিত মনে হয়েছিল। মানুষের বেশে পশুশাবক! এ কী অপদৈবিক ব্যাপার! ভয়ে শাবকটিকে নদীগর্ভেই ছুঁড়ে দেন বসুদেব এবং বিপত্তিটা শুরু হয় ঠিক তারপরেই।

শান্ত যমুনা নিমেষে অশান্ত হয়ে ওঠে। শতশত ঘূর্ণি সৃষ্টি হয় বসুদেবকে কেন্দ্রে রেখে। বসুদেব বুঝতে পারেন, পায়ের নীচের সেই শৃগালীচিহ্নিত গুপ্তপথ সরে যাচ্ছে ক্রমে। বসুদেবও ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছেন নদীমধ্যে। চন্দ্রখণ্ডকে ক্ষুধার্ত কুক্কুরের মতো গ্রাস করছে মেঘের দল। বাতাস হয়ে উঠছে উত্তাল। যমুনার দুই তীরে জড়ো হচ্ছে অসংখ্য শৃগালী। একযোগে ডেকে উঠছে বিকট স্বরে। আর নদীগর্ভ থেকে উঠে আসছে শিশুকণ্ঠের এক ভয়াবহ অট্টহাস।

নিমজ্জমান বসুদেব উপায়ান্তর না দেখে যুক্তকরে বলে ওঠেন, "হে জগৎ-নিয়ন্তা পরাৎপর! হে মহাবিরাট! যদি কখনও কারুর অহিতচিন্তা মনোমধ্যে স্থান না দিয়ে থাকি, যদি চিরকাল ধর্মমার্গেই গমন করে থাকি, তাহলে আজ এ বিপদে আমার রক্ষা হোক। কে এই শিশুকন্যা, যাকে নিজপুত্রের বিনিময়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে নিদারুণ কারাগৃহে? কে এই শিশুকন্যা, যে শৃগালীরূপে ভীষণ নদীমধ্যে পথপ্রদর্শন করে এবং কন্যারূপে গৃহে বাস করে? কে এই কন্যা, যে শিশুকালেই এমন সর্বলোকভয়ঙ্করী? যার প্রতি আমার মনে একই সঙ্গে জাগ্রত হচ্ছে বাৎসল্য ও বিভীষিকা? যদি কণামাত্র পুণ্যবল আমার থাকে, তবে এই রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত হোক।"

অট্টহাস থেমে যায়। তার পরিবর্তে যেন বসুদেবেরই কথার প্রতিধ্বনিস্বরূপ নদীগর্ভ থেকে তীক্ষ্ণ শিশুকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "হোক। হোক। উদ্ঘাটিত হোক।"

নদীর দুই তীরের রবায়মান শিবাকুল অদৃশ্য হয়ে যায়। বলা ভাল, নদীর দুটি কূলই অদৃশ্য হয়ে যায়। বসুদেব দেখেন, যমুনার দুই তীরে মহাশব্দে মাথা তুলছে দুটি সুবিশাল পর্বতশ্রেণী। সম্মুখে তুষারধবল কৈলাস। পশ্চাতে অরণ্য-শ্যামল বিন্ধ্য। লক্ষ-লক্ষ যোজন দূরবর্তী দুটি পর্বতশ্রেণী কোন অবোধ্য মায়াবলে একই নদীর দুই পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুটি পর্বতমালাতেই উৎসবের দীপাবলি। যেন কারুর আগমনের উদযাপন! নদীগর্ভের সেই স্থান, যেখানে ভয়ে বিহ্বল হয়ে শৃগালীশাবকটিকে নিক্ষেপ করেছিলেন বসুদেব, সেটি সহসা আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে। বসুদেব দেখেন, সেই নদীগর্ভ থেকে একে একে উঠে আসছেন কত দিব্য বসন-ভূষণ-প্রহরণ সমন্বিতা দিব্য রমণী! কে এক শ্যামবর্ণা সুন্দরী— চতুর্ভুজা— হস্ত চতুষ্টয়ে খড়্গ-খেটক-পাশাঙ্কুশ— মধুপানে উন্মত্তা— স্রোতের সোপান বেয়ে উঠে যাচ্ছেন কৈলাসে। শুকপক্ষীর কলরবে অমনি ভরে যাচ্ছে কৈলাস।

কে এক ঘোরবর্ণা তেজস্বিনী— সায়ুধা—অষ্টমহাভুজা— শূল-চক্র-গদাদিশস্ত্রসমন্বিতা— গুরুগর্জনরতা—ঢেউ ভেঙে উঠে যাচ্ছেন বিন্ধ্যপর্বতে।

আরও কত দিব্য স্ত্রীমূর্তি নির্গত হচ্ছেন রহস্যসলিলা যমুনার বুকের ভিতর থেকে। যমুনার নানাদিকে উঠে যাচ্ছেন তাঁরা।

অশ্রুবিধৌত চক্ষে অপলকে চেয়ে থাকেন বসুদেব। হেনকালে সুগম্ভীর নারীকণ্ঠে দৈববাণী উচ্চারিত হয়।

"বৎস বসুদেব! শ্রবণ করো। যে কন্যাকে পুত্রের পরিবর্তে কংসালয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে, সেই আমিই ব্রহ্মমার্গপ্রদর্শিনী পরব্রহ্মস্বরূপিণী শিবারূপিণী সদাশিবা। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূতা এই আমিই নারায়ণের লীলানুমোদনকারিণী ও লীলাসহায়িকা। জগতের মহাভাগ্যবলে নারায়ণ নরলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছেন। তাই আমিও বহুরূপে সেই লীলার পরিপুষ্টি সম্পাদন করব। দেখো, আজ মোহরাত্রি। আদ্যাশক্তির পরমৈশ্বর্যশালিনী নবমী মহাবিদ্যাস্বরূপ মাতঙ্গী দেব্যম্বার আবির্ভাব নিশা। বহু কল্পকল্পান্তর পূর্বে ত্রিলোকরক্ষণে দেবী মাতঙ্গী এই তিথিতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

দেখো, এই মহানিশায় কংস-ধ্বংস-মানসে প্রকটিতা হলেন দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। উত্তরকালে ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভ মহাসুরদ্বয়কে মহাযুদ্ধে বিনাশ করবেন।

দেখো, এরই সঙ্গে আজ জাগ্রত হল কত দিব্যবৃত্ত শক্তিপীঠ! বৃন্দাবনের যেই স্থলে দেবী সতীর কেশজাল পতিত হয়েছিল, সেখানে জাগ্রতা হলেন মহামহিমময়ী উমাদেবী।

বৃন্দাবনের আরেক প্রান্তে জাগলেন গোপীগণপ্রপূজিতা দেবী কাত্যায়নী। এঁরই বরে রাসরসের সূচনা।

অম্বিকাবনে জাগলেন অম্বিকা। চন্দ্রভাগা তীরে জাগলেন চন্দ্রভাগাখ্যা দুর্গা। এঁরা সকলেই নারায়ণের নরলীলায় উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবেন।

তুমি, হে পুণ্যকর্মা বসুদেব! অকাতরে আমায় কংসালয়ে নিয়ে যাও। কংসের দ্বারা আমার কোনও ক্ষতিই হবে না। বরং ভূভারহরণের হবে শুভারম্ভ। শিবমস্তু।"

সকল মায়াদৃশ্য অন্তর্হিত হল। বসুদেব দেখলেন, তাঁর কোল জুড়ে রয়েছেন ত্রিদেবপ্রসূতি পরমেশ্বরী। মুখে ভুবনমোহিনী হাসি।

সেই হাসিটুকু স্মরণে রেখে আজও এই দিন থেকে মর্তবাসীর দিন গোনা শুরু। চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন।

সৌরস্নেহ

রচনা - দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, ইংরাজী বিভাগ

চরিত্রসমূহঃ

গাছ, মৌমাছি, হনুমান, ঘুগনিওয়ালা, আইসক্রিমওয়ালা, খুকি, খুকির বোন, মা, সূর্য, চাঁদ

(স্টেজে গাছ সেজে প্রবেশ)

মৌমাছি : আমি হলাম মৌমাছি, / রোজ করি নাচানাচি, / ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াই

আমার মৌচাকে কেউ ঢিল মারলে তার পেছনে হুল ফোটাই। এখন এই গাছটায় মৌচাক বানাই।

হনুমান : সব গাছপালা কেটে দিলে আমি লাফাবো কোথায়? আমার তো মুখটা কালো, যা গরম পড়েছে, এবার পুড়ে স্কিনটাও কালো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। (হুপ হুপ করে লাফাতে লাফাতে) এই গাছটায় উঠে বসি।

খুকি : গাছে কে রে? এই মরেচে, এ যে হনুমান, সব শেষ করে দেবে। তারপর এখান থেকে লাফিয়ে ছাদে উঠে নোংরা করবে, তাড়াই ওটাকে। (হনুমানের দিকে ঢিল ছোঁড়ার ভঙ্গিতে তেড়ে যায়, মৌমাছি তাড়া করে; স্টেজ থেকে বেড়িয়ে আবার প্রবেশ) হনুমান-মৌমাছি এতো উৎপাত সহ্য কে করবে? আজই গাছটাকে উপড়ে দেব। ল্যাঠা চুকে যাবে। (গাছ কেটে, সেটাকে টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে) উফফ, বড্ড গরম পড়েছে।

ঘুগনিওয়ালা : ঘুগনি, ঘুগনি... টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটিল ষ্টার / আমার ঘুগনি সুপারস্টার

হরে কৃষ্ণ হরে হরে / আমার ঘুগনি ঘরে ঘরে

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু / কি দেব আপনাকে, লঙ্কা না লেবু?

খুকি : কাকু একটু ঘুগনি দাওনা, খাবো চেটে চেটে...

ঘুগনিওয়ালা : দাঁড়াও মামণি, দিচ্ছি প্লেটে।

খুকি : কাকু, ঠান্ডা কেন এটা?

ঘুগনিওয়ালা : চারিদিকে যা গরম পড়েছে, আবার ঘুগনিও গরম চাই? খাও না বাপু এই ঠান্ডা-পারা ঘুগনিটা... পয়সাটা মিটিয়ে দাও, আমি আসি।

খুকি : দিচ্ছি কাকু। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি চ্যালা কাঠ এনে দিচ্ছি তোমার পাওনা মিটিয়ে। কোথাও যেও না কিন্তু... (ছুটে বেড়িয়ে যায়)

ঘুগনিওয়ালা : এই মরেছে। আমি ঠান্ডা ঘুগনি দিয়েছি বলে, এরা পিটিয়ে আমায় ঠান্ডা করে দেবে মনে হচ্ছে।

এই তালে পালাই... (ঘুগনিওয়ালা অন্য গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়, খুকি হাতে কাঠ নিয়ে প্রবেশ করে)

আইসক্রিমওয়ালা : আইসক্রিম-আইসক্রিম, দাদাভাই-দিদিভাই এই গরমে নিজেরা কামড়া-কামড়ি না করে আমার এই আইসক্রিমে এক কামড় বসাবেন নাকি?

হামাগুড়ি যে দেয়, আর যে নেয় লাঠি, / সবাই ভালোবাসে কাঠি কিম্বা বাটি

পয়সা নেবোনা গন্ডা-গন্ডা, / গরমে প্রাণ করবো ঠান্ডা,

দু-একটা যদি না বেচতে পারি, / মালিক পিঠে ভাঙবে ডান্ডা।

খুকি : যাঃ ঘুগনিওয়ালা কোথায় পালালো? যাইহোক, আইসক্রিম এসেছে, বাঁচা গেছে। ও আইসক্রিমওয়ালা, দাও একটা আইসক্রিম দাও তো, ওফঃ এই গরমে তো জ্বলেপুড়ে মরেই যাব, তার আগে অন্তত একটা আইসক্রিম খেয়ে নিই শান্তি করে।

আইসক্রিমওয়ালা : (বাক্স থেকে একটা আইসক্রিমের কাঠি বের করে) আইসক্রিম তো সব গ'লে জল, কী যে করি! (পিছনে ফিরে গিয়ে) মামণি, এই কাঠি দিচ্ছি আর এই নাও কিছুটা আইসক্রিম গলা জল। বাড়ি গিয়ে ফ্রিজে ভরে রাখ, জমে গেলে খেও।

খুকি : দুর্নীতি, বেআইনি কাজ, কেউ পুলিশ ডাক, কোর্টে যাব।

আইসক্রিমওয়ালা : এই কেস করেছে! না না, কেস করতে চলেছে... তার আগেই কেসটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মানে মানে কেটে পড়ি। (পিছিয়ে গিয়ে) এই যে দিদিভাই, বিষয়টা

আপনাকে বুঝতে হবে— আ-আ-আমি না, আইসক্রিম গলা থেকে শরীর জ্বলা এই সব ঘটনার পিছনে দায়ী সূর্য!

খুকি : সূর্য মানে মাথার উপরের সূর্য?

আইসক্রিমওয়ালা : হ্যাঁ ওই যে,

মাথার উপর গোল, / রোজ শুধু জ্বলছে

ছাত-টুপি না নিলেই, / শরীরগুলো টলছে

সারা বছর দিচ্ছে আলো, / ছ'টা মাসের তেজে

শাড়ি-ধুতি-বালিশ-বিছানা / সব-ই যাচ্ছে ভিজে

খুকি : আ মো'লো যা! তাকে আবার দায়ী করা যায় নাকি? তুমি বলো তা কি সম্ভব? তুমি নিজের দায় এড়ানোর জন্য এরকম বলছো...

আইসক্রিমওয়ালা : আরে না না। কী মুশকিল! (একটু থমকে ভেবে) শোনো, এই যে ঝাঁঝাঁ-রোদে জীবন তোমার জ্বলছে কিংবা আইসক্রিম খেতে পেলে না, সবই এই সূর্যের জন্য। (একটু থেমে যায়, হঠাৎ কিছু বুদ্ধি এসেছে মাথায় এমনভাবে)

শোনো মামণি, তুমি যে শাস্তি দিতে চাইছো তা যার প্রাপ্য তাকে এখানে ডাকার একটা উপায় আমার কাছে আছে। এই নাও, এই একপিস আছে সেরা জিনিস-সূর্যের পাঁচালী। এটা নিয়ে নিয়ম মতো পুজো করে দেখো, সূর্য নিজে আসবেন তোমার কাছে। তখন তাকে প্রশ্ন কোরো যে এরম অবস্থা কেন করে রেখেছে পৃথিবীটার।

খুকি : (হাতে নিয়ে খুলে) ওরে বাপরে! এতো বেঙ্গলি আমি পড়তে পারি না, মা-কে বলি পড়িয়ে দিতে। (আইসক্রিমওয়ালা তার পড়ার সুযোগে হাওয়া)

খুকি : যাঃ আইসক্রিমওয়ালা চলে গেলো! ও মা, মা... (বলতে বলতে বেরিয়ে যাওয়া)

খুকির বোন : (নাচ শেখার তোড়জোড় চলছে-এসো হে বৈশাখ) এ দিদি আইসক্রিম পেলি না?

খুকি : নাহ। হতচ্ছাড়া সূর্যটা সব শেষ করে দিচ্ছে, ঘরে শুতে-বসতে দিচ্ছে না, একটা আইসক্রিম খাবো, তারও উপায় নেই। তুই আবার এই ভরদুপুরে নাচন-কোঁদন করবি নাকি? ও মা, আমি কিন্তু ওকে চুলের মুঠি ধরে পেটাবো, বলে দিচ্ছি।

মা : (মঞ্চে প্রবেশ) আবার শুরু করলি ঝামেলা তোরা? আমি কিন্তু বাবাকে ডাকবো বলে দিচ্ছি। বোনের ২৫ শে বৈশাখে পাড়ায় অনুষ্ঠানে মঞ্চে নাচ করতে হবে। ওকে জ্বালাস না, তুই নিজের গানের প্রাকটিস কর।

খুকি : আর গান, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তারপর সব কাজ, একটা সুযোগ যখন পেয়েছি...

আজকে এই পাঁচালী পড়ব। আইসক্রিমওয়ালা বলেছে এটা পড়লে সূর্য আসবে। একবার আসুক, আজ ওর একদিন কি আমার একদিন আমি দেখিয়ে ছাড়ব!

মা : সূর্য আবার কে? বয়ফ্রেন্ড নাকি? কই দেখি দেখি পাঁচালী-টা! (শুধুমাত্র বইয়ের উপরের কভারটা দেখে কপালে ঠেকিয়ে) ও মা, এ যে সূর্যিদেবের পাঁচালী! এ তুই পেলি কোত্থেকে? পড়-পড় মা, তোর সুমতি হয়েছে।

খুকি : কিন্তু মা, আমি তো এতো বেঙ্গলি পড়তে পারি না, তুমি একটু পড়িয়ে দাও?

মা : আমার আজকে অনেক কাজ রে মা। তুই একা একা পড়। কোনও বানান বুঝতে না পারলে আমায় ডাকিস, আমি বলে দেব।

খুকি : সূর্য হচ্ছে ভীষণ ভালো, সকাল সকাল ওঠে / ঘুম ভেঙে গেলেই সবাই, পটি করতে ছোটে।

মর্নিং ওয়াক করতে বেরোই, কমলা তোমার রং / সারাদিনটাই জ্বালিয়ে মারছো, বুঝিনা কাজের ঢং

তোমার আছে ন'টা গালফ্রেন্ড, পৃথিবী সবার সেরা, / তোমার দয়াতেই, লাবণ্যে পূর্ণ এই ধরা

এমন জ্বলুনি জ্বালাচ্ছ তুমি, জ্বলছে যে ঘরবাড়ী / স্কুল-কলেজে ছুটি পরে গেল, দুম করে তাড়াতাড়ি।

তোমার কোন কামাই নেইকো, আসো রোজ দুয়ারে / ঘামাচি গায়ে চিৎকার করি— উঃ ওরে বাবারে! (হঠাৎ করে স্টেজে হলুদ আলো, ধোঁয়া)

সূর্য : সারা সকাল লাইটিং করে, সন্ধেয় একটু শুতে গেছি, সেটুকুর ও জো নেই! কে আবার মিসকল দিচ্ছে।

খুকি : এই তুই কে? আই মিন হু আর ইউ?

সূর্য : আস্তে আস্তে, গলার আওয়াজ জোর কোরো না। আমি একটু জোর বাড়ালে আর দাঁড়াতে পারবে না।

খুকি : ও মা-আ, বাড়িতে ভিখিরি ঢুকেছে। তোমরা কি সবাই মরে গেছ? কে ঢুকতে দিলো তোমাকে মানে ইয়ে তোকে? কে তুই বল নাহলে চ্যালা কাঠ দিয়ে পিটাবো।

সূর্য : আমাকে কেউ সূর্য বলে, কেউ বলে সান / এই জগতের যত প্রাণ, সব আমার দান

সবাই কিন্তু জানে যে আমি ভীষণ হট, / সানস্ক্রিন মেখে না বেরোলেই মুখে ডার্ক স্পট...

খুকি : (মনে মনে) আরিব্বাস। আইসক্রিমওয়ালা তো ম্যাজিক জানে, তারমানে এটা রিয়েল সূর্য, আর সে এসেছে ওর পাঁচালী পড়েই।

আচ্ছা, এসেছই যখন, এটা বলো তো আজকাল এতো গরম কেন দিচ্ছ? একবার চিন্তা করে বল তো — এভাবে কি বাঁচা যায়?

সূর্য : দেখো মামনি, আমার আইডি কার্ডে কী লেখা আছে! স্বর্গের ভোটে আমিই আলো দেওয়ার টেন্ডার পেয়ে এসেছি; ৬ মাস উত্তরে জ্বালাবো, ৬ মাস দক্ষিণে... এটা আমার এখানে সিজিন - একটু করে খাবো না? (একটু থেমে) শুধু কি আমি গরম-ই দিই? এই যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু সব এ তো হচ্ছে আমার জন্যেই। সেটা?

খুকি : টেন্ডার মানে? ওপরেও এইসব ক্যাচাল? হায় ভগবান! যেসব ফলমূলের কথা বলছ, এই গরমে বাঁচবো তবে তো খাবো ওসব! আর যা দাম সব কিছুর , কীভাবে খাবো সব জানিনা...

সূর্য : এসব সমস্যা তোমরাই সৃষ্টি করেছো। গাছ কমেছে, জল-হাওয়া সব নষ্ট, এ সব তোমাদেরই করা।

খুকি : না না, ওসব বললে হবে না। তুমি একটু আলো কমাও, নাহলে কিন্তু...

সূর্য : নাহলে কী?

খুকি : না-হ-লে (একটু থেমে) তোমার ওই আলো জ্বলার টেন্ডার আমরা ভগবানের কাছে দাবি করে চাঁদকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। নিশ্চই এরম কোনো ব্যবস্থা আছে...

সূর্য : চাঁদ? হা-হা-হা! মুখপুরি নিজের নেই আলো, সে আবার দেবে তোদের আলো? হাসালি।

খুকি : হাসির কিছু নেই! তোমায় ডাকার মতো চাঁদকে ডাকার কোনো পাঁচালী থাকলে আজই ওকে ডেকে এর মীমাংসা করতাম।

সূর্য : সে আমি না হয় ওকে ডেকে আনছি, আজকে অমাবস্যা, ওর আজকে নাইট ডিউটি অফ আছে, দেখ ওর সাথে কী কথা বলার আছে!

খুকি : ডাকো, ডাকো দেখি! কথা বলে দেখি...

সূর্য : বাচ্চাদের পড়ায় টিপ, চাঁদ তার নাম, / আমি যখন আকাশে থাকিনা, তখনি তার দাম

কখনও সে গোল বল , কখনও ভিক্ষার বাটি , / স্টেজে এস চাঁদমামা , করি হাঁটাহাঁটি

চাঁদ : আজকে অমাবস্যা, আমার অফ-ডে, তার মধ্যে কে আবার ডাকাডাকি করে মুডটা বিগড়ে দিলো? এ কি সূর্য, তুই ডাকছিলি মনে হলো! কী ব্যাপার?

খুকি : উনি ডাকলেও মেন ব্যাপারটা আমার সাথে। একটু মন দিয়ে শুনুন আমার কথাটা।

চাঁদ : আচ্ছা, বলো।

খুকি : 'সূর্য আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে, আমরা ওর ক্ষমতার বদল চাই। আমি ভেবেছি সব লোকজন কে বলে - বুঝিয়ে আলো জ্বলার টেন্ডার আমরা ভগবানের কাছে দাবি করে তোমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো।

চাঁদ : শোনো মামণি, দেবলোকে ভোট হয় আর প্রত্যেকবার এই সূর্য ওর গরম দেখিয়ে সেই ভোট জিতে নেয়। তুমি বা তোমরা যদি সবাই ওর বিরুদ্ধে যাও, আমি কথা দিচ্ছি আমি জিতে এসে তোমাদের স্নিগ্ধ আলো দিয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধ রাখব।

সূর্য : আস্তে আস্তে। একটু ব্রেক কষ! খুব বেড়েছিস কিন্তু! কার থেকে আলো নিয়ে ওদের দিবি, সেটা ভুলে যাচ্ছিস!

খুকির বোন : (হঠাৎ প্রবেশ) এ দিদি কারা এরা? এখানে কি আলোচনা করছে?

খুকি : দেখ না বোন এখানে লড়াই চলছে যে সূর্য না চাঁদ কে আমাদের আলো দেবে! আচ্ছা তুই কার সাপোর্টার?

খুকির বোন : এ দিদি এর থেকে তো ভাল যে আমরা গাছ লাগাই তাহলে আমাদের যেই আলো দিক না কেন কারওরই বাঁচতে কোন অসুবিধা হবে না। (বোন বেরিয়ে গিয়ে গাছগুলোকে তুলে আনে)

চাঁদ : একটা সুযোগ ছিল আমার ক্ষমতা হাতে পাবার তোর জন্য সেটা হলো না; তোকে আমি মেরে ফেলবো। (বোনের দিকে সে তেড়ে যায়, সূর্য নিজের তেজ বাড়াতেই চাঁদ বসে পরে।)

খুকি : তুই আবার এইসব আগাছাগুলো এনেছিস? দুই বোন মারামারি করতে করতে সবাই থমকে যায়। সূর্যের দিকে তাকায়। চাঁদ সূর্যকে দোষারোপ করতে শুরু করে।)

চাঁদ : বন্ধুগণ, নিজেরা মারামারি না করে এই সূর্যকে তাড়ান। সব সমস্যা আমি মিটিয়ে দেব।

সূর্য : থাক, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। নিজের অপমান কার-ই বা করাতে ভালো লাগে? একদিন আমাকে তোমরাই আবার ডেকে আনবে, আমার কথা মিলিয়ে নিও। (সূর্য বেরিয়ে যায়, সবাই উল্লাস করতে করতে হঠাৎ গলা ধরে স্টেজে পড়ে যাচ্ছে, মৌমাছি আসে, হনুমানও লাফায়, কোনও গাছ পালা নেই, তারা কষ্টের আওয়াজ করতে করতে ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করে, এমন সময়...)

মৌমাছি : হনুমান ভাই, পৃথিবীতে আর কিছু নাই, আমরা মড়ার আগে একবার সূর্যদেবকে বলি আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দিতে। (মৌমাছি গোঁ-গোঁ করতে থাকে, হনুমান লাফায়। সূর্য আসেন।)

সূর্য : হায়, মানুষ সব শেষ করে ফেলল। আমি যে পাষাণে প্রাণ বাঁধি, তার কি কোনও মূল্য নেই? একটা গাছ লাগাতে তো হয় না, নিজে নিজেই কোথায় ফেলা আঁটি থেকে গাছ বেড়ে ওঠে, মানুষ তাকে পুরো সাফ করে দিল! সব শেষ করে দিয়েছে এরা, তাও একবার শেষ চেষ্টা করি। এই একটা গাছ দিয়ে গেলাম, দেখি আবার একবার সবকিছু শুরু থেকে শুরু করার। (গাছকে ধরে এনে বসায়, গাছ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় আর স্টেজের আলো বদলায়। আস্তে আস্তে সবাই উঠে দাঁড়ায়, হঠাৎ সবাই স্থির হয়ে যায়।)

মৌমাছি : বসে বসে নাটক দেখছেন কী? যান বাড়ি গিয়ে গাছ লাগান।

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

ডালিয়া হোসেন

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

কবি, তোমার লেখা একটি কবিতা

"যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব"

শিখিয়েছিল আমাকে কীভাবে জীবনটাকে দেখব।

জানি না, তুমি কোন অর্থে বলেছিলে,

কিন্তু আমি আমাকে চিনেছি নতুন করে।

মনে হলো সত্যি তো ছেড়ে যাওয়া কি

এতটা সহজ?

আমার বাড়ির উঠোনে একটা গন্ধরাজ আর

টগর ফুলের গাছ আছে।

হ্যাঁ, একটা শিউলি ফুলের গাছও আছে।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় গন্ধরাজের সুগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে থাকি, কেমন যেন নেশা লাগে।

বাঙালি সব বাড়িতেই বোধহয় একটি করে

দক্ষিণের জানালা থাকে, আমাদেরও ছিল।

ভোরে ওই জানালার সামনে পড়তে বসতে

ভীষণ ভালো লাগতো।

সামনে ছোট্ট বাগান, তারপর রাস্তা,

একটু দূরেই একটি চালকল,

বেমানান লাগছে?

আমার কিন্তু খুব ভালো লাগতো।

কেন? বলতে পারবোনা।

আমি তো অনায়াসেই চলে যেতে পারি,

কিন্তু, কেন যাব?

আমার প্রিয়জনেরা আমার কাছেই থাকবে

তবু, কেন যাব?

বাড়ির সামনের গেটটাকে ঘিরে একটা মাধবীলতার

কুঞ্জ বানিয়েছিলাম,

ওটা পেরোতে গেলেই আমার আমার শাড়ীর আঁচল

লতায় জড়িয়ে যেত

মনে হতো ও আমাকে যেতে দেবে না।

শরতে শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত

ভোরবেলা তার সুগন্ধ আমাকে টানতো

আমি কেন চলে যাব?

এতো আমার একার কাহিনী নয়

এতো সবার।

তবু ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষের জন্য

মানুষকে তার ভালোবাসার নীড় ছাড়তে হয়।

আমার মতো তাদেরও মনে হয়েছে

যেতে পারি কিন্তু কেন যাব?

হায়রে! এ প্রতিবাদ কে শুনবে?

তোমার দেশ, তোমার বাড়ি, তোমার কাজের জায়গা তোমাকে ছাড়তে হবে,

কারণ, আমরা যে দেশটিকেই ভাগ করে দিয়েছি।

তোমার প্রতিবাদ শোনার ইচ্ছে আমাদের নেই।

স্বাধীন দেশে থাকবে, এর চেয়ে বেশি

আর কী চাই?

১৪ অগাস্ট (দেশভাগের ভয়াবহতা-স্মরণ দিবস)

অপেক্ষা

খেয়ালী দেবনাথ

স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

অপেক্ষা করছি এককোঁটা ভালোবাসার জন্য,

যা হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি।

অপেক্ষা করছি একটুখানি ছোঁয়ার জন্য,

যার স্পর্শে হৃদয়ের চাঞ্চল্য হবে সত্য।

অপেক্ষা করছি দেখা করার জন্য,

যা মনে আনবে শান্তি আর তৃপ্তি।

অপেক্ষা করছি এককোঁটা বৃষ্টির জন্য,

যা মুছে দেবে সব রাগ-অভিমান।

অপেক্ষা করছি অল্প একটু সময়ের জন্য,

যা মুছে দেবে অনেক দিনের দূরত্ব।

অপেক্ষা করছি শুধু মাত্র তোমার জন্য,

কারণ তুমি যে আমার চাওয়া পাওয়ার শেষ ঠিকানা।

ভিখারিণী মেয়ে

সীমা বৈরাগী

সাম্মানিক বাংলা, চতুর্থ সেমেস্টার

"দিন মান যায় প্রায়

রোদ গেল গাছের আসায়।

কে ওগো! গায় গান

পথে বসি এমন সময়?

ওঃ! আমারই ভুল

গান তো নয়?

প্রাণে কত কী ব্যথা পেয়ে

কাঁদে এক ভিখারিণী মেয়ে।

কত দুঃখ— আহা রে! না জানি

শুকিয়েছে সোনা মুখখানি,

ছেঁড়া শাড়ি জ্বরে ঢাকল তার কায়

কতদিন তেল বুঝি পড়ে নাই মাথায়।

এই শোনো বড় বেদনায়

নিজেকে কেঁদে পরকে কাঁদায়।

"এ জগতে কেউ মোর নাই

আমি আজ ভিখারিনী তাই,

দুয়ারে দুয়ারে ডাকি

ভিক্ষা দাও বলে,

ঘর নাই দুয়ার নাই

রাতে থাকি তরুতলে।

কিছু নাই আমার সম্বল

সবে ধন নয়নেরই জল।

তিন দিন ভাত নেই পেটে

চলিতে পারিনা পথ হেঁটে

আকাশে উঠিছে মেঘ

উঠিছে পরান,

যদি আসে ঝড় জল

কোথা পাব স্থান,

এই মাত্র ডাকি ভিক্ষা দাও হরি

আজ যেন একেবারে মরি,

দারুন দুঃখের জ্বালা সহে

বেঁচে আছি আধামরা হয়ে।

এখন বাসনা শুধু

জনমের মতন

মরণের কোলে চাই

করিতে শয়ন।

এ জগতে কেহ যার নাই

মরণ তুমি তার ভাই।

"কচি মুখে বিষাদ গান

শুনে কার কান্দে না পরাণ

আয় তোরা ভাই বোন

সবে মিলে যাই,

ভিখারিনী আখিঁ জল

নয়ন মুছাই।

আমাদের মানুষের পরাণ

আর কেহ হবে না

নিরেট পাষাণ।"

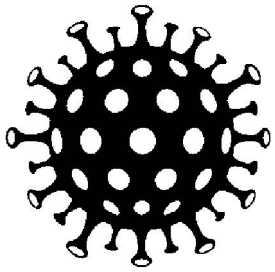

করোনা ক্রোড়পত্র

করোনার কালবেলা : একটি সাক্ষাৎকার

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

ড. প্রসেনজিৎ বসু, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

"কত হাজার বারের পর আকাশ দেখা যাবে

কতটা কান পাতলে পরে কান্না শোনা যাবে

কত হাজার মরলে তবে মানবে তুমি শেষে,

বড্ড বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে।"

পেরিয়ে এলাম করোনা। রোগ আর মৃত্যুর এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। অবশেষে যেন একটু আশার আকাশ দেখা যাচ্ছে। কান্না থামেনি, কিন্তু কমেছে। আর আমরা মানতে বাধ্য হয়েছি, বড্ড বেশি মানুষ ভেসে গেছেন এই অতিমারীর স্রোতে। কিন্তু অতিমারী শুধু আমাদের মৃত্যুই চিনিয়ে যায়নি; চিনিয়েছে জীবনকেও। নিজের মৃত্যুর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ অন্যের জীবন রক্ষার লড়াই লড়েছেন। এমনই একজন — শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাস্টারমশাই, তথা জাতীয় সেবা প্রকল্পের দ্বিতীয় ইউনিটের আধিকারিক। তাঁর যথাযথ নেতৃত্বে জাতীয় সেবা প্রকল্পের নির্ভীক ও উদ্যমী স্বেচ্ছাসেবীগণ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর্তি নিবারণে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে নিয়মিত মিলেছে সেই সব কাজের স্বীকৃতি। 'ধূলিগন্ধা'র এই সংখ্যায় রইল অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার। পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন বাংলা বিভাগের আরেক মাস্টারমশাই ড. প্রসেনজিৎ বসু।

প্রসেনজিৎ বসু : ব্যক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে অতিমারী কোন রূপ নিয়ে এসেছিল? কীভাবে সূত্রপাত আপনার কর্মযজ্ঞের?

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ব্যক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায় বরাবর ঘরকুনো। অসামাজিক। আবার এই গণ্ডিটাই আমাকে আমার মতন একটা জগৎ বানাতে সহযোগিতা করেছে। আমার নিজস্ব একটি অভিমত সামাজিক চাপ থেকে আপনা আপনি গড়ে উঠেছে। নিজেকে খোলা মঞ্চেও আমি ছোটলোক শ্রেণির শিক্ষক বলি। বলতে বাধ্য হয়েছি। বাধ্য হই। কিন্তু অতিমারীর সময়ে আমার আমিকে

একটা নতুন আঙ্গিকে আমি চিনতে পারি। চারিদিক শূন্য। যে কলেজে না গেলে পেটের ভাত আমার হজম হয় না, সেখানে শূন্যতা। যে শিক্ষার্থীদের মুখগুলো আসলে আমার বেঁচে থাকার রসদ, তাদের দেখতে পাচ্ছি না। এরই ভেতর কালনা থেকে একটি ছেলে ফোন করলো লক ডাউনের পনেরো দিনের মাথায়। ইচ্ছে করেই ছেলেটির নাম গোপন রাখলাম। বললো তার বাবা দোকানে দোকানে জল দেয়। সেটা বন্ধ। নিজে যে কাঠের মিস্ত্রীর হেলপারের কাজ করে তা বন্ধ। ঘরে চাল নেই। বললো - আপনি তো NSS থেকে আমাদের গ্রামে গ্রামে নিয়ে গেছেন। মানুষের জন্য কাজ করেন। আমাদের একটু খাবারের ব্যবস্থা করে দেবেন ? আমি বললাম তোকে পাঠাবো কীকরে? ছেলেটা বললো আপনি বললে আমি সাইকেল করেই চলে যাব। আমি ওকে আসতে বললাম। পরদিন এলো। এক মাসের মতন শুকনো মুদির জিনিস চাল, ইত্যাদি দিলাম। ও চলে গেল। ভেতরটা অশান্ত হচ্ছে ক্রমে। দিন নষ্ট না করে রাজু আলি, নিতিশাদের ফোন করলাম। সিদ্ধান্ত হল আমরা যে যার মতন মানুষের কাছে ভিক্ষে চেয়ে আমাদের দত্তকগ্রাম সহ অন্যান্যদের দিতে বলবো সপ্তাহে দু'দিন। শুরুও করলাম। দেখলাম আমরা পারছি। একটা অহংবোধ ভাঙলো। আমি অসামাজিক - এই যে প্রচ্ছন্ন অহং, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মনে নেই কোন মহারাজের বা শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর কার বক্তৃতা। এক মহারাজের কাছে একজনার প্রশ্ন ছিল - ঠাকুরের মন্দিরে মন বসে না কেন? মহারাজ উত্তর দিয়েছিলেন বেলুড় মঠের সামনে যে ভিক্ষুকেরা বসে থাকে দেখেছো? ওই প্রতিটি ভিক্ষুককে তুমি যে সাহায্য করো তখন যদি তাঁদের ভাবো অভুক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে দিচ্ছ, তবে মন বসবে। কী সুন্দর সহজ কথা। আসলে ওই সেদিনকার ভিক্ষে করা, নিজের যেটুকু আছে অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া - সেটাকে গভীরভাবে চিনিয়ে দিল কোভিড। চেনালো NSSI আর এই NSS না থাকলে আমি বিগ জিরো। এই দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন আমাদের অধ্যক্ষ ড. প্রতাপ ব্যানার্জী। আর এটা পেয়েছিলাম বলেই আমার আসল শ্রীরামকৃষ্ণদের চেনালো কোভিড। আমার পূজার পথকে চেনালো কোভিড।

প্রসেনজিৎ বসু : অতিমারী আপনাকে নতুন কী চেনাল? নতুন কী শেখাল?

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : অতিমারীর সময়ে একদিকে যেমন জীব রূপে শিব পূজা আমায় চেনালো, জড়িয়ে গেলাম স্থানিক ইটভাটায় আটকে যাওয়া মানুষগুলোর সাথে। ধীরে ধীরে খাবার দিতে দিতে বাচ্চাগুলোর পড়াশুনার জন্য ভাবনা। বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার পাঠাগারে আমাদের সোনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে ক্লাস করানো। শেষে অতিমারী কাটলে তাদের সরকারি স্কুলে ভর্তির আওতায় নিয়ে আসা।

এটা একটা দিক। আর একটা দিক অনলাইনে কোনওদিন সড়গড় নয় যে আমি, সেই আমির ভেতরেও যে শক্তি আছে সেটা চেনা। অনলাইন ক্লাস, অনলাইন মিটিং, ওয়েবিনারের আয়োজন

যেমন চললো, তেমনি আমার এই পর্বটা না এলে হুগলি জেলার বিগত শতকের তিরিশ থেকে আশির দশকের কবিদের নিয়ে ধরে ধরে প্রায় শ পাঁচেক জনার ওপর সপ্তাহে দু'দিন একটা ওয়েব ম্যাগাজিনে লিখলাম "হুগলি জেলার কবি ও কবিতা।" বই হয়ে বের হল তার পরে। এটা হতোই না কোভিড না এলে।

প্রসেনজিৎ বসু : এই কর্মোদ্দীপনায় আপনার পারিপার্শ্বের ভূমিকা কী?

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : মহাবিদ্যালয়ে আমি যখন যুক্ত হই সেই ১৯৯৯, তখন কলেজের সত্যিকারের হিরো বলতে যা বোঝায়, যিনি বড় জায়গায় আছেন কথায় কথায় সেটা না বুঝিয়ে নীচের স্তর পর্যন্ত মিশতে সক্ষম সেই মানুষ সুকুমার বাবু। অধ্যাপক সুকুমার দাঁ। তিনি প্রস্তাব দিলেন একটা অন লাইন মিটিং করার। অধ্যক্ষ তার আয়োজন করলেন। সমস্ত অধ্যাপকরা তাঁদের একদিনের মাইনে দিলেন কলেজ ফান্ডে। সেই টাকায় সুকুমার বাবু, আমি, আর কলেজের সর্ব সময়ের সঙ্গী স্থানীয় ব্যবসাহী শ্যামল সাহা মিলে এক মাসের চাল ডাল মুদিখানার মালপত্র কিনে প্রায় শ'খানেক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পরিবারের জন্য দেওয়া হল। তারপর সমান্তরালভাবে আমাদের মুষ্টি ভিক্ষার বিষয়টি চলছিল। প্রায় দু'বছর সেটা চালানো হল। লক ডাউনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, তাদের কলেজে ডেকে এই সমস্ত সামগ্রী দেওয়া চললো। এই খবর বাইরে যেতেই কিছু সংস্থা এলেন। আমাদের ভলেন্টিয়াররা তাদের নিয়ে নর নারায়ণ সেবা করার সুযোগ পেল। দোকানে দোকানে চেয়ে চিন্তে সেই দু বারের পুজোয় জামা কাপড় দেওয়া হল শতাধিক মানুষকে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে স্যানেটাইজেশানের কাজ শুরু হয়েছিল। পথ কুকুরদের খাওয়ানোর কাজ করা হয়েছিল সেই সময়। যে কাজ আমাদের কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক কালাচাঁদ সাঁই প্রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কালনায় এখনও নীরবে করেন। এই পর্বেই ইয়াস ঝড়। ডিটেনশান ক্যাম্প করা হল কলেজে। দশটির মতন পরিবার সেখানে থাকতে এলেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের দেখাশুনা, খাবারদাবারের কাজ করেছে নিরলসভাবে। ইটভাটায় সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনে বিনে পয়সায় জামা কাপড়ের হাট বসে। পুরোনো, নতুন জামা কাপড় সেখানে সংগ্রহ করে স্বেচ্ছাসেবকরা। তারাই দোকান সাজিয়ে বসে। যার যেটা পছন্দ সে সেই জিনিসটি সংগ্রহ করে। আমাদের অধ্যক্ষ তো নিয়ম করে সেই জন্য কাপড় জামা আজও নিয়ে আসেন।

প্রসেনজিৎ বসু : প্রতিকূলতা আসেনি? কীভাবে মোকাবিলা করেছেন তার?

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : সাধারণ মানুষদের মাঝে দুঃসময়ে হাত বাড়িয়ে দেবার যে মানসিকতা দেখেছি আমি তাকেই মনে রাখতে চাই মৃত্যু পর্যন্ত। সমালোচনা যে করা হয় নি তা নয়। সেগুলো এতটাই ক্ষুদ্র অংশের বক্তব্য তা পাত্তাই দিই নি। সাধারণ মানুষ আমাদের

স্বেচ্ছাসেবকদের বিশ্বাস করে দু'হাত ভরে না দিলে আমাদের পক্ষে এ কাজ কোনওদিনই সম্ভব ছিল না। আর যখন আক্রমণে ভেঙেছি, তখন সুকুমার বাবু বা আমাদের অধ্যক্ষের কথায় মন ভিজে গেছে। ওঁরা দু'জন ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের যাবতীয় সেবা পরিচালনার চালিকা শক্তি।

প্রসেনজিৎ বসু : জীবনের এই বিশেষ কালপর্বকে কীভাবে মনে রাখবেন?

পার্থ চট্টোপাধ্যায় : করোনা সবাইকে কী শিখিয়েছে জানিনা। আমার অনুভব হল — মৃত্যুকে আমি চিনেছি। আসলে সেই সময়ের মৃত্যু মিছিল। সেই সময়ের অনাহার আমাকে চিনিয়েছে - ওটাই অমোঘ। আর মৃত্যু যদি অমোঘ তা হলে কেন কেবল আত্মকেন্দ্রিক থাকা! আমার সঙ্গে তো কিছুই আসলে যাবে না। তবে কেন আমার আমার করা। ওই যে ছাত্রটির কথা প্রথমে বললাম - সে যদি ওই ফোনটা আমায় না করতো তবে আমার এ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা হতো না। আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি অভুক্তের কান্নার মাঝে। এখন মনে হয় আমার ইটভাটা, আমার লঙ্কাতলা গ্রাম, আমার পরিবেশ আমার প্রকৃতিই এক একজন শ্রীরামকৃষ্ণ। এক কথায় করোনা আমাকে চেনালো আমার ঠাকুরকে আমি পুজোর ছলে ভুলে ছিলাম। আমার চারিদিকে এত শ্রীরামকৃষ্ণকে ছেড়ে এত বেলুড় মঠকে ছেড়ে আমি কেবল ঠাকুর ঘরের ব্যর্থ পূজায় ছিলাম। করোনা এসেছিল। সে আমার শ্রীরামকৃষ্ণকে চেনালো। তাই অতি কষ্ট না হলে যেমন কেষ্ট ধরা দেন না, করোনা না এলে ঠাকুরকে আমি চিনতাম না। কোভিড কেন জানি না আমার কাছে তাই আমার ঠাকুরকে চেনাবার সময়। আসলে অভিসারের তো একটা সময় লাগে। অভিসার তো ডিভাইন কল এন্ড স্পিরিচুয়াল কোয়েস্ট। বাঁশি বাজবে যখন তখন তো শ্রীমতী ভগবানকে পেতে ছুটবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁশিতে ডেকেছিলেন তখন। তাই তাঁকে আমার করে পেয়েছি।

করোনা

শীর্ষা মুখোপাধ্যায়

ভূগোল বিভাগ, দ্বিতীয় সেমেস্টার

পৃথিবী, সে তো বিস্ময়কর

বৈচিত্র্যে সাকার

কিন্তু আজ অত্যাচারের ফলস্বরূপ

এসেছে শুধু হাহাকার।।

স্তব্ধতা আজ গ্রাস করেছে উল্লাস

বেরিয়েছে মৃত্যু-মিছিল কত দেশে দেশে

ভারতবর্ষও বাদ যায়নি

কোভিড উনিশে।।

নিত্যতার এখন সঙ্গী হয়েছে

করোনা ভাইরাস

পৃথিবীর কত দেশে মৃত্যুপুরী

যেমন চীন, ইতালি, ফ্রান্স।।

আজ গোটা দেশ ভাইরাসের প্রকোপে

হারিয়েছে কত প্রাণ

করোনার মুক্তিতে মানুষদের বাঁচাতে

আছে আজ ডাক্তাররূপী ভগবান।।

আমাদের বাঁচাতে সতর্ক রাখতে

এড়াতে কোভিড উনিশ

রাত-দিন এক করে

ভরসা দিচ্ছে পুলিশ।।

সব কিছু ভুলে গিয়ে

আজ আমরা মানবধর্মী

চিন্তা দূরে রাখতে

পাশে আছে স্বাস্থ্যকর্মী।।

চারিদিকে শুধু মারণ ভাইরাস, মানবজাতি আশঙ্কায়

লাখে লাখে মৃত্যু শুধুই, ধুঁকছে যে পৃথিবী করোনায়।।

জানি সব ঠিক হয়ে যাবে, তবু দিনটা জানা বাকি

পৃথিবী আবার উঠবে হেসে, এই আশাটাই রাখি।।

নতুন ভোর আসবে ফিরে, আশ্চর্যের প্রদীপ আলাদিন

প্রতিকারের একটাই পথ, ভাইরাস মোকাবিলায় ভ্যাকসিন।।

জানি ভারতবর্ষ আসবে নিয়ে, নতুন আলোয় ফিরবে

আমরাও তখন বলে উঠবো—

"ভারত আবার জগৎ সভায়—

শ্রেষ্ঠ আসন লভে"।

ACADEMIC FACULTIES

1. Dr. Pratap Banerjee Principal

DEPARTMENT OF COMMERCE

2. Prof. Sukumar Dan Associate Professor
3. Dr. Subham Dastidar Assistant Professor
4. Prof. Arnab Ghosh State Aided College Teacher
5. Prof. Sujit Dutta State Aided College Teacher
6. Prof. Paromita Banerjee State Aided College Teacher

Department of English

7. Dr. Abhijit Ghosh Assistant Professor
8. Prof. Soma Biswas Assistant Professor
9. Prof. Amrita Chakraborty State Aided College Teacher
10. Prof. Dibyendu Bhattacharya State Aided College Teacher
11. Prof. Balaka Halder State Aided College Teacher

Department of Mathematics

12. Dr. Biswajit Paul Assistant Professor
13. Prof. Sanjukta Das State Aided College Teacher
14. Prof. Papiya Ghosh State Aided College Teacher
15. Prof. Tapa Manna State Aided College Teacher

Department of Physical Education

16. Prof. Amitab Kumar Mondal State Aided College Teacher
17. Prof. Priyatosh Mondal State Aided College Teacher

Department of Education

18. Prof. Prayosi Adak State Aided College Teacher

Department of Philosophy

19. Prof. Mousumi Saha State Aided College Teacher

20. Prof. Subhendu Mondal State Aided College Teacher

Department of Chemistry

21. Dr. Namrata Saha State Aided College Teacher

22. Prof. Rimpa Mondal State Aided College Teacher

23. Prof. Amit kumar De State Aided College Teacher

24. Prof. Somshuddha Marik State Aided College Teacher

25. Prof. Paromita Halder State Aided College Teacher

Department of Sanskrit

26. Dr. Debalina Ghosh State Aided College Teacher

27. Prof. Sangita Mondal State Aided College Teacher

28. Prof. Maloy Ghosh State Aided College Teacher

29. Prof. Manidipa Modak State Aided College Teacher

Department of Physics

30. Prof. Uday Ghosh State Aided College Teacher

Department of Economics

31. Prof. Dilip Kumar Chatterjee Associate Professor

32. Prof. Kalachand Sain State Aided College Teacher

Department of Bengali

33. Dr. Asima Halder Assistant Professor

34. Dr. Prosenjit Bose Assistant Professor

35. Prof. Partha Chattopadhyay State Aided College Teacher

36. Dr. Susmita Das State Aided College Teacher

Department of Geography

37. Prof. Debapriya Ghosh State Aided College Teacher

38. Prof. Subhasis Biswas State Aided College Teacher

Department of Political Science

39. Prof. Dalia Hossain Associate Professor

40. Prof. Hasina khatun State Aided College Teacher

41. Prof. Kheyali Debnath State Aided College Teacher

42. Prof. Soma Sarkar State Aided College Teacher

Department of History

43. Prof. Akbar Hossain Associate Professor

44. Prof. Biswajit Munda Assistant Professor

45. Prof. Bani Chatterjee State Aided College Teacher

46. Prof. Piu Banerjee State Aided College Teacher

47. Prof. Saifudden SK. State Aided College Teacher

48. Prof. Mitali Ghosh State Aided College Teacher

Non Teaching Staff

1. Mr Ajay Bhar - Cashier

2. Mrs Anjali Pramanik - Lady Attendant

3. Mr. Narayan Mandal

4. Mr. Suman Chatterjee

5. Mr. Partha Mukhopadhyay

6. Mrs. Mina Ghosh (Dam)

7. Mr. Supratim Ghosh

8. Mr. Prashanta Mondal

9. Mr. Suman Nath

10. Mr. Goutam Mondal

Governing Body: 2021-2022	
President of the Governing Body	Shri Monoranjan Bapari
Principal & Secretary of the G.B.	Dr. Pratap Banerjee
State Govt. Nominee	1. Prof. Partha Chattopadhyay State Aided College Teacher of Bengali, Balagarh Bijoy Krishna Mahavidyalaya
	2. Mr. Tarun Sen
Nominee of West Bengal Council of Higher Education	Prof. Subrata Rana Assistant Prof. of English Education Khalisani Mahavidyalaya
University Nominee	1. Dr. Basudeb Halder Associate Prof. of Geography Sarat Centenary College
	2. Dr. Shrabanti Banerjee Associate Professor of Chemistry RRR Mahavidyalaya
Teachers' Representative	1. Prof. Sukumar Dan Associate Professor of Commerce
	2. Md. Akbar Hossain Associate Professor of History
	3. Dr. Biswajit Paul Assistant Professor of Mathematics
Non-Teaching Representative	Shri Ajay Bhar